

মা ৩ রু ম



প্রকৃতি

মাওঝুম
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ২০০৫

প্রকাশনায়
হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম

সম্পাদনা
প্রকাশনা বিভাগ
হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম

প্রকাশকাল
৫ জুন ২০০৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও নির্মাণ
হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম ও পাভেল পার্থ
প্রচ্ছদ-এর ছবিটি
ইউ. পি. এল. কর্তৃক প্রকাশিত
'দি চিটাগাং হিল ট্র্যাক্স লিভিং ইন এ বোর্ডারল্যান্ড'
বই থেকে সংগৃহীত

শব্দ বিন্যাস
নন্দিত কম্পিউটার্স
১১৯, আজিজ সুপার মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০

ডাক যোগাযোগ
মাওরুম
প্রযত্নে : যথাসম্ভব, ৭৫ আজিজ সুপার মার্কেট (দ্বিতীয় তলা)
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০।
ই-মেইল : mawrum@hotmail.com

বিকিকিনি : পনের টাকা।

সম্পাদকীয়

১ম বর্ষ পেরিয়ে ২য় বর্ষ অভিমুখে মাওরুম-এর সাহসী অভিযাত্রা। পার্বত্য অঞ্চলের স্থবির হয়ে পড়া চিন্তার স্রোতকে কিছুটা গতি দেওয়ার প্রয়াসে মাওরুম বিরামহীন বিনির্মাণে বিশ্বাসী। কিন্তু ভূমিই যদি না থাকে বিনির্মাণ হবে কিসের উপর? যাদের জন্য এই প্রয়াস তারাই যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে এই নির্মাণতো অর্থহীন হয়ে যাবে।

আমাদের প্রিয় পার্বত্য চট্টগ্রাম আবারও লোলুপ শাসকগোষ্ঠীর গোত্রাসের শিকার হতে চলেছে। জুম জনগণের হাজার বছরের পুরানো জনপদ, প্রিয় অরণ্য, প্রিয় জুম, প্রিয় ঝরণা, বিবু পাখির মিষ্টি ডাক পরিচিত সবকিছুই তলিয়ে যাচ্ছে অধিগ্রহণ নামক এক অতল গহ্বরে। পার্বত্য অঞ্চলেও প্রান্তিক হয়ে যাওয়া এই জাতিগুলোর শেষ আবাসভূমিটুকুও শাসকদের কাছে চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই শাসকদের রাক্ষুসে খিদা মিটবে কবে? আদিবাসী দরদীরাও বড় নিশুপ। তারা বুঝতে চাচ্ছেন না, যদি এই বৈচিত্রপূর্ণ নৃ-জাতিগুলো না থাকে তাহলে গবেষণা, মানবাধিকার, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, বিদেশ ভ্রমণ, দাতাদের সাহায্য এরকম অনেক কিছু থেকে এই দরদী গোষ্ঠীটি বঞ্চিত হবে। আশা করছি নিজেদের স্বার্থেই এই আদিবাসী দরদীরা মৌনতা ভাঙবেন।

বান্দরবান সদর ও রুমা সেনানিবাস সম্প্রসারণ, খাগড়াছড়ির বাবুছড়ায় বিডিআর ক্যাম্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ এই সব কিসের আলামত? প্রাণবৈচিত্র্য, জাতিবৈচিত্র্য, অরণ্য ধ্বংস করে পার্বত্য অঞ্চল কাদের আবাসভূমিতে পরিণত হতে চলেছে? যদি পার্বত্য অঞ্চলের নৃ-জাতিগুলোর সর্বশেষ আবাসস্থলকে রাষ্ট্রযন্ত্র অধিগ্রহণ নামক ভয়াল থাবায় দুমড়িয়ে মুচড়িয়ে গুণশান করে দিতে চায় তাহলে পাহাড়ের জনপদে আবারও আত্মজিজ্ঞাসা ধ্বনিত হবে, প্রশ্ন উঠবে-“জুলি-ন উধিম কিস্তেই?”। আসুন মানবতাবিরোধী এই অধিগ্রহণ নামক লোলুপতার বিরুদ্ধে সকলে একসাথে জুলে উঠি।

পৃষ্ঠা

সূচি

০৭ ☐ রাজনীতিতে সংস্কৃতির প্রভাব / সমীরণ চাক্‌মা

১১ ☐ ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের রাজ্যাভিষেক ও দরবার সংস্কৃতি /
প্রভাংশু ত্রিপুরা

১৫ ☒ এসএস চাক্‌মার আত্মজীবনী বা একটি
নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর উপাখ্যান / সোহরাব হাসান

২০ ☒ কেন প্রতিবিপ্লবী হলাম? / অনিল চাক্‌মা (গোর্কি)

২৭ ☒ পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন সংকট ও সম্ভাবনা / মং শৈ ব্রাই

কবিতা

৩১ ☐ ব্যঙ্গমার ব্যথা ফিস্ ফিস্ / ডেভিড স্বজন বিপ্লব
মাকড়সা / ও বা য়ে দ আ কা শ

৩২ ☐ চালচিত্র / শ্রাবণী আলম

৩৩ ☐ চেতনার জাহাজ / শরৎ চাক্‌মা

৩৪ ☐ চাকুরীর সখ, এনজিও / এম. কে সাহা

৩৫ ☐ গুজ-হার-অ / পরমেশ্বর চাক্‌মা

আঁকড়ে থেকো না (গুজ-হার-অ, কবিতার বাংলা

ভাবানুবাদ) / পরমেশ্বর চাক্‌মা

৩৬ ☐ প্রান্তিক জাতির বীজের অধিকার / পাভেল পার্শ

৪৬ ☒ পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ-সজ্জ / কুমার কো কো রায়,
এম-এ

৫০ ☐ বর্ষবরণ-বর্ষবিদায় উৎসব 'বিশুব সংক্রান্ত' দেশে দেশে /
পুলক জীবন খীসা

৫৫ ☐ বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে / দীপায়ন খীসা

রাজনীতিতে সংস্কৃতির প্রভাব

সমীরণ চাকমা

রা জনীতি ও সংস্কৃতি এ-দুটোকে অনেকে আলাদা ভাবে দেখেন। এভাবে দেখার কারণ মূলতঃ দুটো। একটা অংশ এভাবে দেখার কারণ তাদের অজ্ঞতা। অর্থাৎ সংস্কৃতির ব্যাপারে তাদের যথাযথ জ্ঞানের অভাব। অপর অংশ আসলে সংস্কৃতি কি এবং কিভাবে গড়ে ওঠে ও বিকাশ লাভ করে তা তারা ভালোভাবে জানেন। তা সত্ত্বেও এভাবে মনে করার কারণ সাধারণ জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাতে তাদের শোষণ নির্যাতন কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না হয়। জনগণ যাতে সচেতন ভাবে অগ্রসর হতে না পারে। অধিকার আদায়ের বৃহত্তর সংগ্রামে সামিল হতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়। এই সব বিষয় বিবেচনায় রেখে সংস্কৃতি এবং রাজনীতি একটির সাথে অপরটি অবিচ্ছিন্ন, সে কথাটি সাধারণ জনগণকে ধারণা দেওয়ার জন্য যে কোনো প্রগতিশীল লেখক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক কর্মীকে বিভিন্ন ভাবে প্রচার চালাতে হবে। যাতে জনগণ একটা সাধারণ ধারণা পেতে পারে। এসব বিবেচনায় রেখে সংস্কৃতি কি? কীভাবে গড়ে উঠে এবং প্রকাশ পায়? রাজনীতির সাথে সংস্কৃতির সম্পর্ক কি? ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করবো।

প্রত্যেক সমাজে বা রাষ্ট্রে তার একটি নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক রূপ থাকে। সেই সমাজে বা রাষ্ট্রে তার উৎপাদন পদ্ধতি এবং সেই সাথে সংগতি রেখে সৃষ্টি হয় বা সৃষ্টি করা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। যদি উদাহরণ দিয়ে বলি- কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন পদ্ধতিতে মূল ভিত্তি হচ্ছে জমি, এই জমিতে উৎপাদন করতে গিয়ে যন্ত্রপাতি ও কৃষি মজুর হচ্ছে উৎপাদনের মূল শক্তি। প্রাক সামন্তবাদী সমাজে এ সকল উৎপাদনের উপায়গুলোর একক মালিক হচ্ছেন জমির মালিক। যদিও বর্তমানে তা অনেকখানি শিথিল হলেও এখনো অনেক জায়গায় কৃষি শ্রমিকেরা জমি মালিকের নিকট বিভিন্ন ভাবে বাঁধা থাকে। জমির মালিক ও কৃষি মজুরের এই সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য উৎপাদনে ব্যাঘাত না ঘটানোর জন্য তৈরি হতো আইন-কানুন, জীবন প্রণালী এবং বিনোদনসহ সকল প্রকার নিয়ম নীতি। এই নীতিই হচ্ছে রাজনীতি।

এটাকে বলা হয় উৎপাদন সম্পর্ক। এই উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি হয় মূলতঃ উৎপাদন পদ্ধতির উপর নির্ভর করে। শিল্পশ্রমোত্তর দেশগুলোতে, তাদের উৎপাদন পদ্ধতি যেহেতু শিল্পভিত্তিক, তাদের উৎপাদন সম্পর্কও তৈরি হয় সেভাবে। অর্থাৎ শিল্প মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক কিভাবে টিকে থাকবে সেভাবে তৈরি করা হয় আইন-কানুন, সমাজব্যবস্থা, শিল্প-কলা ইত্যাদি। অর্থাৎ যেসকল সমাজব্যবস্থা আমরা দেখে এসেছি, অর্থনৈতিক ক্ষমতা যার হাতে থাকে তারাই সমাজ ও রাষ্ট্রের মালিক হয়। সেই কারণে সমাজ যারা নিয়ন্ত্রণ করে অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে আইন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা, তারাই তৈরি করে। এই সব আইন-কানুন সহ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য যা কিছু তৈরি হবে সবই তাদের অনুকূলে হবে এটাই স্বাভাবিক। এইসব উৎপাদন পদ্ধতি ও তার উপর গড়ে উঠা উৎপাদন সম্পর্ক মিলেই গঠিত হয় একটি সমাজ বা রাষ্ট্র। উৎপাদন পদ্ধতি হচ্ছে একটা সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি বা অবকাঠামো। এই অবকাঠামোর সাথে সংগতি রেখে তৈরি হয় আইন-কানুন, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি তথা সমাজ কিভাবে চলবে তার রূপরেখা। এটাকে বলা হয় সমাজের বা রাষ্ট্রের উপরিকাঠামো। নির্দিষ্ট সমাজে উপরিকাঠামোর যে সকল সীমারেখা বেধে দেয়া হয় সেই সীমা রেখা অতিক্রমকারী হচ্ছেন সমাজবিরোধী, রাষ্ট্রবিরোধী তথা আইন অমান্যকারী। এই অমান্যকারীদের শাস্তি কত ভয়াবহ হয় ইতিহাসের দিকে তাকালে তার প্রমাণ মেলে। এত কঠোর আইন-কানুন থাকা সত্ত্বেও বিদ্রোহ হয়, আইন অমান্য করে। সেটা কখন হয়? সেটা ঘটে যখন উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশ লাভ করে এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছায়, যখন সেই উৎপাদন পদ্ধতিকে উৎপাদন সম্পর্ক আর ধারণ করতে পারে না, তখনই উৎপাদন পদ্ধতির উপর আঘাত আসে, সৃষ্টি হয় নতুন সমাজ। তাকেই আমরা বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করতে দেখি। এতক্ষণ যে উৎপাদন সম্পর্কের কথা বা উপরিকাঠামোর কথা বললাম সেই উপরিকাঠামোর একটি অংশ হচ্ছে সংস্কৃতি। সেই কারণে সংস্কৃতি কোন স্থির বিষয় নয়। সমাজে অর্থনৈতিক তথা অবকাঠামো যখন পরিবর্তন ঘটে উপরিকাঠামোরও পরিবর্তন হয়। উপরিকাঠামোর একটি অংশ হিসেবে সংস্কৃতিও পরিবর্তন হতে বাধ্য।

একটি নির্দিষ্ট সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রণালীই হচ্ছে সেই সমাজের সংস্কৃতি। একই জাতি বা রাষ্ট্রের মানুষ হলে তাদের সংস্কৃতি এক হবে এ কথাটি ঠিক না। কারণ সেই রাষ্ট্রে একই জাতি বা জাতিসত্ত্বা হলেও তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা বিভিন্ন পর্যায়ে থাকার এবং ভিন্নধর্মী উৎপাদন প্রণালীর সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও ভিন্নতা আসে। বিশেষ করে এই সাম্রাজ্যবাদী যুগে সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোথাও বিরাজিত নেই। এভাবে সংস্কৃতির চরিত্রও এককভাবে কোনো সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে না। ইউরোপে যেভাবে শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে সামন্ত শক্তিকে পরাভূত করে বুর্জোয়া সমস্ত জায়গা দখল করে নিয়েছে আমাদের এলাকায় তথা পার্বত্য চট্টগ্রামে তেমন কিছু ঘটেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সমগ্র বাংলাদেশে যে প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হয়েছে বা হচ্ছে তা অনেকাংশে সাম্রাজ্যবাদের লগ্নীপুঞ্জির মাধ্যমে। সাম্রাজ্যবাদের বিনিয়োগকৃত পুঁজি নির্বিঘ্ন করতে যেখানে যেভাবে কাজে লাগে সেখানে সেভাবে কাজ করে। কতকক্ষেত্রে সামন্তবাদের সাথে আপোষ করে কতকক্ষেত্রে দ্বন্দ্বও থাকে। সমস্ত বাংলাদেশে

যে সকল পুঁজি শিল্প-কারখানায় বা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত আছে তা অধিকাংশ সাম্রাজ্যবাদের বিলগ্ন পুঁজি। তাই এখানে যেমন সামন্তবাদের অবশেষ রয়েছে তেমনি মুৎসুদ্দিবুর্জোয়ারও বিকাশ ঘটেছে। তার ব্যতিক্রম আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামও নয়। এই দেশের অর্থনীতিতে যে পরিমাণ সামন্তবাদের অবশেষ বিদ্যমান তার চেয়ে সংস্কৃতিতে আরও অধিক পরিমাণে তা বিদ্যমান। বাংলাদেশের যেকোনো অঞ্চলের চেয়ে পার্বত্য এলাকা অর্থনৈতিক ভাবে অনগ্রসর। তাছাড়া অর্থনীতিসহ অন্যান্য ধারাগুলো যে পরিমাণে পরিবর্তন ঘটে সংস্কৃতি পরিবর্তনের ধারা তার চেয়ে অনেক মন্থর। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল থেকে সামন্ত রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো উঠে গেলেও পার্বত্য এলাকায় সেই প্রতিষ্ঠানগুলো এখনও খর্বাকারভাবে টিকে আছে। এভাবে টিকে থাকার কারণ অত্রএলাকার জনগণের স্বার্থের কারণে নয়। মূলতঃ শাসকশ্রেণীর স্বার্থের কারণে। তাই এই সকল প্রভাব গ্রামীণ জনগণের আর্থিক জীবনের উপর না পরলেও সংস্কৃতিতে যথেষ্ট প্রভাব পরে। কারণ শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি এদেরকে বিভিন্নভাবে প্রচার মাধ্যমে উর্ধ্ব তুলে ধরে। এতে জনগণ চিন্তাগতভাবে প্রভাবিত হয়। কারণ এদের শাসন শোষণে দীর্ঘ সময় ধরে থাকার কারণে এই সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট জনগণ আজীবন থাকে। সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠান (UNDP, ADB) সহ সকল এনজিওগুলো যারা স্থানীয় অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেয় সে সকল প্রতিষ্ঠানের টাকা এই পার্বত্য এলাকায় কি ভাবে বিনিয়োগ হবে, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সে সকল পরিকল্পনার প্রধান দায়িত্ব সামন্তীয়দের হাতে দিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে নগ্নভাবে সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদের সাথে আপোষ করতে দ্বিধা করে না। যারা এতদিন, এতযুগ ধরে পাহাড়ী জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রধান বাধা হয়ে কাজ করেছে, তারাই আজ জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ করার জন্য এনজিও খুলে বসে রয়েছে। এটা কি চরম প্রতিক্রিয়াশীলের কাজ না? যে কোনো প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক কর্মী এগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দরকার। আসলে জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার নামে কৌশলে প্রগতিশীল সংস্কৃতির প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করা, সাধারণ জনগণকে সংগ্রাম বিমুখ করা, নিজেদের অধিকারের প্রতি সচেতন হওয়ার পরিবর্তে দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া—এই গুলিই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের লগ্নিকৃত পুঁজির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাই রাজনীতি থেকে দূরে থেকে সত্যিকার গণমুখী সংস্কৃতি চর্চা করার দাবীটিও এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীলতা। কারণ নিরপেক্ষ সংস্কৃতির চর্চার অর্থ দাঁড়ায় শাসকশ্রেণীর লেজুড়বৃদ্ধি করা, প্রগতিশীল সংস্কৃতির বিপক্ষে দাঁড়ানো। সমাজের উপরিকাঠামোর একটা অংশ কোনদিন রাজনৈতিক নিরপেক্ষ হতে পারে না।

পূর্বে উল্লেখ করেছি সংস্কৃতিকে জাতীয়তার ভিত্তিতে দেখা ঠিক না। তার কারণ জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কৃতিকে দেখলে তার স্বরূপকে দেখা হয় না অর্থাৎ ভেতরের চেহারাটাকে দেখা হয় না। কেবলমাত্র সংস্কৃতির বাহ্যিক রূপটাকে দেখা হবে। কারণ সংস্কৃতি দেশ বা জাতির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয় না বা গড়ে উঠে না। এটি মূলতঃ বা প্রধানত অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে যা আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন একই জাতি হওয়া যে কিছু বাহ্যিক বিষয় মিল থাকে সেগুলো মূলতঃ

প্রথাগত বিষয় (CUSTOM)। ঐ বাহ্যিক যে সকল বিষয়গুলো মিল থাকে সেগুলোকে জাতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তারা অমুক জাতির সমুক জাতির সংস্কৃতি হিসেবে প্রচার করে। এইগুলো প্রচারে লক্ষ-জক্ষ করে। নিজেদেরকে এক একজন সংস্কৃতির সেবক হিসেবে প্রচার করতে থাকে। তাই লেনিন এদেরকে বুর্জোয়ার কুপমডুকতা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

সংস্কৃতির আসল রূপ দেখতে হলে তাকে সমাজের বিরাজমান অর্থনীতি তথা উৎপাদন পদ্ধতির ভিত্তিতে দেখতে হবে। তবেই সংস্কৃতির আসল রূপ বেরিয়ে আসবে। একটি সমাজে একই উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যবস্থা দীর্ঘদিন বিরাজ করে। এই সব কাজকর্ম করতে গিয়ে তাদের যে সকল কার্যাদি সম্পূর্ণ করতে হয় বা জীবন-আচার পরিচালিত হয় তাকেই ঘিরে গড়ে উঠে সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি মানুষের ধী-শক্তির ফল, মানুষের আহরিত জ্ঞানের ফসলই হচ্ছে সংস্কৃতি। মানুষের এই জ্ঞান কোথেকে আসে? এই জ্ঞান আসে মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামে যা কিছু মোকাবিলা করতে হচ্ছে যা কিছু প্রত্যক্ষ করছে তারই ভিত্তিতে জ্ঞান অর্জন করে, তা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করে এবং বিকাশ ঘটায়। এটার সামগ্রিক রূপই সংস্কৃতি। একই জাতি হলে সংস্কৃতি একই হবে এই কথাটি ঠিক না। অর্থনৈতিক অবস্থার ভিন্নতার কারণে তাদের জীবন আচারও ভিন্ন থাকে। তাই সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য। যদি আমরা শ্রেণী অবস্থান থেকে সংস্কৃতিকে বিচার করি তাহলে সংস্কৃতির ঐক্য অনেক বেশী খুঁজে পাবো। একই অর্থনৈতিক অবস্থার জীবন ধারণকারী ভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর জীবন আচারের তাদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপে সাদৃশ্য দেখতে পাবো। জাতীয় ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে প্রকাশ ভঙ্গীগুলো ভিন্নতা থাকতে পারে।

অর্থনীতি ও সমাজ যেহেতু ক্রমবিকাশমান সেইহেতু সংস্কৃতিও বিকাশমান। তাই সংস্কৃতি কোন স্থির বিষয় নয়। যারা জাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণের কথা বলে তারা আদতে শ্রেণীগত হৃদটাকে আড়াল করে তাদের শোষণ নির্যাতনের ধারাটা অব্যাহত রাখতে চায়। সুতরাং সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছে ও ঘটাবে শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক পার্টির সুশিক্ষিত সাংস্কৃতিক কর্মী। কারণ তারা সমাজের অব্যবস্থা ও জরা জীর্ণকে বদলাতে চায়। তারা সমাজের পশ্চাৎপদতাকে বাতিল করে মানুষের কল্যাণকে গ্রহণ করে। জাতীয় সংস্কৃতির প্রবক্তারা তার বিপরীত। তারা পশ্চাৎপদতাকে ধরে রাখতে চায়। সেই কারণে বর্তমান দুনিয়ায় মুক্তিকামী জনগণের প্রধান শত্রু সাম্রাজ্যবাদের টাকা দিয়ে জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার নামে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের পথে যারা গোলক ধাঁধা সৃষ্টি করেছে। তাই বিপ্লবী সংস্কৃতি কর্মীদের কাজ হচ্ছে এদের চরিত্র উন্মোচন করে রাজনৈতিক সংগ্রামের পাশাপাশি সংস্কৃতির সংগ্রামকে এদের বিরুদ্ধে চালিত করা, নয়ত সংগ্রামের চূড়ান্ত বিজয় সম্ভব নয়।

ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের রাজ্যাভিষেক ও দরবার সংস্কৃতি

প্রভাংশু ত্রিপুরা

এ কথা অতীব সত্য যে, ত্রিপুরা জাতির রাজ্য শাসনকাণ্ডে ত্রিপুরা রাজ্যের ভাগ্যাকাশে কোনো ইউনিয়ন জ্যাক ছিল না। বৃটিশ সরকার ভারত বর্ষের সবকটি দেশীয় রাজ্য সমূহকে কুক্ষিগত করতে সমর্থ হলেও ত্রিপুরা জাতির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারে নি, এটাই ছিল ত্রিপুরা জাতির সবিশেষ ঐতিহাসিক গৌরব। অধিকন্তু, বৃটিশের সাথে ত্রিপুরার বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে বিরোধ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বহুবার। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য মিত্রশক্তির পক্ষালম্বন করেছিল এবং বৃটিশ সরকারকে প্রচুর সৈন্য ও অর্থ দিয়ে সাহায্য ও সহযোগীতা করেছিল।

স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হিসেবে রাজন্যবর্গ স্বীয় জাতির কুলীয় প্রথানুযায়ী এক মহারাজার দেহান্তরের পর মৃতের উত্তরসূরী হিসেবে সিংহাসন আরোহণ ও রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান করতেন। ত্রিপুরা রাজন্যবর্গের প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ “রাজমালায়” মহারাজাদের রাজ্যাভিষেক সম্পর্কে যে বিবরণ বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

“ত্রিপুরা জাতির কুলীয় প্রথানুযায়ী ত্রিপুরা রাজন্যবর্গ রাজ্যাভিষেকের পূর্বদিনে অধিবাস ও সংযমব্রত পালন করতেন। নিশাকালে ভূমিশয্যা গ্রহণ করতেন। বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্র হতে সংগৃহীত মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করে পঞ্চগব্য দিয়ে মস্তক সিক্ত করতেন। রাজ্যের চারি বর্গশ্রেণী থেকে নির্বাচিত চারজন লোক যথাক্রমে পূর্ব দিকে স্বর্ণনির্মিত কলসীতে ঘৃত নিয়ে দন্ডায়মান পুরোহিত, পশ্চিম দিকে মাটির কলসীতে দুধ নিয়ে দণ্ডায়মান ক্ষত্রিয় এবং দক্ষিণ দিকে তাম্র নির্মিত কলসীতে দধি নিয়ে দন্ডায়মান বৈশ্য, এ চারিবর্গের লোক ভাবীমহারাজার মস্তকে পঞ্চগব্য দিয়ে সিক্তন করতেন। অতঃপর, ভাবীমহারাজার নামে প্রস্তাবিত দুটি নামে মাস্তলিক প্রদীপ প্রজ্বলন করা হতো। এ সময় ভাবীমহারাজা সপ্ততীর্থ থেকে সংগৃহীত জল দিয়ে স্নান ও সজ্জাদি সম্পন্ন করতেন।

অভিষেকের দিন ভাবীমহারাজা প্রত্যুষে যজ্ঞসূত্র পৈতা ধারণ করতেন এবং চণ্ডীপূজায় অর্চিত রাজকীয় পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করতেন। অতঃপর লগ্নানুযায়ী মন্ত্রীবর্গ, সচিববৃন্দ, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, সামন্তবর্গ, জমিদারবর্গ, দফা প্রধানবৃন্দ, সমাজপতিবৃন্দ, সেনাপতিবৃন্দ ও উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাবৃন্দের সমভিব্যবহারে আশ্রয়ী সজ্জিত হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অভিষেক মঞ্চের দিকে শোভাযাত্রা সহকারে গমন করতেন। শোভাযাত্রাকালে দু'দলে বিভক্ত অশ্বারোহী সেনাদলের একটি দল লাল ও হলুদের মাঝখানে সূর্যধ্বজ খচিত জাতীয় পতাকা এবং অন্যদল হনুমান লাঙ্ঘিত ত্রিকোণাকৃতি গৈরিক বর্ণের সামরিক পতাকা বহন করতেন। অভিষেক মঞ্চে পৌঁছার পর পদাতিক, গোলন্দাজ ও অশ্বারোহীবাহিনী ভাবীমহারাজাকে প্রথানুযায়ী অভিষাদন জানাতেন। অভিষাদন গ্রহণ করার পর ভাবীমহারাজা অভিষেক মঞ্চে আরোহণপূর্বক তথায় স্থাপিত সিংহাসনে অঞ্জলি দিয়ে সপ্তবার পরিক্রমা করে সিংহাসন আরোহণপূর্বক “রাজমুদ্রা” যোগে উপবেশন করতেন। এ সময় ধর্মীয় পুরোহিতগণ স্বর্ণপাত্র থেকে যজ্ঞবারি রাজ মস্তকে সিঞ্চণ করতেন। এরূপে অভিষেক ক্রিয়ার প্রথম পর্ব সমাপনান্তে সেনাপতিগণ অবনত মস্তকে প্রণাম ও অভিষাদন (গার্ড অব অনার) প্রদান করতেন। এরপর ছত্রধর রাজ মস্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করতেন। সিংহাসনের দু'পার্শ্বে হনুমান ধ্বজ, সূর্যধ্বজ, চন্দ্র ধ্বজ, রাজদন্ড, ত্রিশূল ধ্বজ, আরঙ্গী, মীনমানব, পাঞ্জা ইত্যাদি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতীক সমূহ ধারণ করে দন্ডায়মান হতেন। দু'জন চামর ধারী শ্বেত চামর সিঞ্চন করতেন। অতঃপর মহারাজ প্রাসাদ আবেষ্টনীতে ত্রিপুরা জাতির তান্ত্রিক প্রথামতে “সিবরাই ও সংগ্রামা দেবতার পূজা করতেন। সিবরাই ও সংগ্রামা শক্তির প্রতীক। (তথ্য সূত্র: শ্রী শ্রী রাজমালা, প্রথম লহর: ত্রিপুরা রাজ্যভিষেকের বিশেষ নিয়ম, পৃষ্ঠা : ২০-২১)

এবার স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বশেষ মহারাজা পঞ্চশ্রী বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের রাজ্যভিষেক উৎসব উপলক্ষ্যে তৎকালীন স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের চীফ সেক্রেটারী শ্রী বি. কে. সেন কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১৯ শে জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৫ই মাঘ ১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ, ঘোষণাপত্রটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

১। ভাবী মহারাজা প্রাসাদ থেকে যাত্রা উৎসব পালন করে অভিষেক মন্ডপের দিকে অগ্রসর হন। অভিষেক মন্ডপে রাজ-পুরোহিত প্রভৃ গোস্বামী তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

২। তারপর ভাবী মহারাজা পাল্কাতে আরোহণ করেন এবং ১৩ বার কামানের তোপধ্বনি পরেই অভিষেক মন্ডপের দিকে অগ্রসর হন। সম্মুখে একটি আলাদা পাল্কাতে থাকেন শ্রী শ্রী লক্ষীনারায়ণ বিগ্রহ। শোভা যাত্রায় রাজপুরোহিত, রাজপণ্ডিত, মন্ত্রীবর্গ, সামন্তরাজবর্গ, সচিববৃন্দ, সহকারী পদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ, দফা প্রধানগণ, গোত্র প্রধানগণ, সমাজপতিগণ ও কীর্তিনিয়াগণ চলতে শুরু করে। পশ্চাতে থাকেন কপি ধ্বজ বহনকারী সুসজ্জিতদল, বাদ্যযন্ত্রদল, ১২ জন সেনাপতি ও ৬ জন দেহরক্ষী।

৩। অভিষেক মন্ডপের সম্মুখের দেউরীতে দরবারীগণ ভাবীমহারাজকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং ভাবী মহারাজ পাল্কা থেকে নামার পর পরই ১৩ বার কামানের তোপধ্বনি সহযোগে সুসজ্জিত সেনাদের গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন। এ সময় সামরিক সঙ্গীত ব্যান্ডে বাজতে থাকে। এই পর্যায়ে ৬ জন চোপদার (সেনা অফিসার) মহারাজার উপস্থিতি

ঘোষণা করেন। তার পর লক্ষীনারায়ণ বিগ্রহের সম্মুখে চোপদারগণ, দরবারীগণ, ছত্রধারী এবং অমাত্যবর্গদের নিয়ে মহারাজা অভিষেক মন্ডপের দিকে অগ্রসর হন। এ সময় উপস্থিত সকল দরবারীগণ মন্ডপের সম্মুখে অবনত মস্তকে স্থির হয়ে দাঁড়ান এবং ভাবীমহারাজ মঞ্চে আরোহণ করেন।

৪। ভাবীমহারাজ সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলেই অভিষেক ক্রিয়া শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিতগণ স্বস্তিবাচন ও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন। ভাবীমহারাজ প্রথমে লক্ষীনারায়ণ বিগ্রহ ও পরে সিংহাসনে অঞ্জলিপ্রদান পূর্বক রাজপণ্ডিত, দ্বারপণ্ডিত ও অন্য দুই পণ্ডিত সহযোগে সপ্তবার প্রদক্ষিণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন। এর পর পরই কামানের তোপধ্বনি করা হয়। তখন রাজ বাদকদল কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় সঙ্গীত বাজাতে থাকে এবং তোপদার সিংহাসন আরোহণ ঘোষণা করেন। মহারাজা রাজমুদ্রা যোগে সিংহাসনে উপবেশন করার সাথে সাথে প্রধান সেনাপতি মহারাজাকে প্রণাম করে মাল্য ভূষিত করেন এবং মহারাজা নিজেই চন্দন ধারণ করে নিজ হস্তে তিলক অঙ্কন করেন। (তথ্য সূত্র : গোমতী : জানুয়ারী/ ০২ ত্রিপুরা নৃপতির অভিষেক: ডঃ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী)।

ত্রিপুরা রাজদরবার সংস্কৃতি

ত্রিপুরা মহারাজের দরবার অনুষ্ঠানকালে বিশেষ নিয়মনীতি অনুসৃত হতো। প্রতিদিন রাজদরবার আহ্বান করা হতো। মহারাজা সিংহাসনে উপবেশন করার পূর্বে সিংহাসন অর্চনা করা হতো। অমাত্যবর্গ ও দেহরক্ষী সমভিব্যাহারে মহারাজা দরবারে আগমন করতেন। বিউগলে আগমনী বার্তা ঘোষণা করতেন। আগমনী ঘোষণা নিম্নরূপ:-

“হুশিয়ার! সাবধান। বিষম সমর বিজয়ী চন্দ্রবংশীয় অতুলনীয় উচ্চকুলোদ্ভব মহামহিম ত্রিপুরা মহারাজাধিরাজ, পঞ্চশ্রী মহারাজ, শ্রীযুত....মাণিক্য বাহাদুর (K. C.S.I), নরপতে রাদেশোহয়ং, কারকবর্গেষু, প্রচরতু, পরমস্যা বিরাজিত দরবারে আগমন হচ্ছেন.....। এখানে ত্রিপুরা মহারাজ্যের দরবারে আগমনী বার্তাটাও বিশেষ তাৎপর্যব্যঞ্জক।

বিষম সমর বিজয়ী : যিনি রাজ্য ও রাজ্যবাসী প্রজাগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান ও প্রতিপালনের সক্ষম। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে বিষম সমর বিজয়ী আখ্যায়িত করা হয়।

পঞ্চশ্রী : শ্রী অর্থ ঐশ্বর্য্য। পঞ্চশ্রী অর্থ যিনি পাঁচটি ঐশ্বর্য্য ও মহিমার ধারক। এ পাঁচটি ঐশ্বর্য্য হলো:-

১। যিনি কাউকে কর দেন না।

২। যিনি কারোর বশ্যতা স্বীকার করেন না।

৩। যিনি রাজ্যের একচ্ছত্র দণ্ডমুণ্ডের মালিক।

৪। যার রাজ্য ও প্রজাবৃন্দ পুরক্ষিত এবং

৫। যিনি ধর্মীয় বিধিবিধানের প্রতিপালক তাঁকে পঞ্চশ্রী নামে আখ্যায়িত করা হয়।

নরপতেরা দেশোহয়ং : যে মহারাজার অধীনে ন্যূনতম পাঁচজন সামান্তরাজ বিরাজ করেন, এমন মহারাজকে “নরপতেরাদেশোহয়ং” বলা হয়। বলাবাহুল্য ত্রিপুরা মহারাজ্যের অধীনে ১৩ জন সামন্ত নরপতি এবং ১৮ জন জমিদার ছিল।

কারকবর্গেষু : কারকবর্গেষুর অর্থ হলো কর্মকারক। রাষ্ট্রপরিচালনা করার ক্ষেত্রে যে মহারাজার ন্যূনতম পাঁচজন মন্ত্রী ও সচিববৃন্দ নিয়োজিত আছেন সেই মহারাজকে “কারকবর্গেষু” বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রচরতু : যে মহারাজার দরবারে ন্যূনতম পাঁচজন অতুলনীয় গুণীব্যক্তিত্বের সমভিব্যবহারে বিরাজিত সেই মহারাজকে “প্রচরতু পরমস্য” আখ্যায়িত করা হয়।

দরবারে আগমন কালে সকল অমাত্যবর্গ, মন্ত্রীবর্গ, সামন্তবর্গ, জমিদারবর্গ, সেনাপতিবৃন্দ, দফা প্রধানবৃন্দ, গোত্র প্রধানগণ, সমাজপতিগণ এবং রাজকর্মচারীগণ ও দর্শনপ্রার্থীগণ সকলকে দন্ডায়মান অবস্থায় থাকতে হতো। মহারাজা সিংহাসনে উপবেশন করার পর কাংস্য ধ্বনি হতো। কাংস্য ধ্বনি ঘোষিত হবার পর দরবারস্থ সকলে নিজ নিজ আসনে উপবেশন করতেন। রাজ পুরোহিতের স্বস্তি বাচনের পর যথারীতি দরবারের কার্যক্রম শুরু হতো ॥ (সূত্র : রাজামালা : প্রথম লহর : দরবারের বিশেষ নিয়ম)

তথ্য সূত্র :

- ১। রাজামালা : প্রথম লহর : কালী প্রসন্নসেন
- ২। Military History of Tripura by Debabrata Goswami.
- ৩। History of Tripura by E, F, sandays
- ৪। গোমতী : জানুয়ারী সংখ্যা/০২
ত্রিপুরা অধিশ্বরের অভিষেক : ডঃ দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী।

এসএস চাকমার আত্মজীবনী বা একটি নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর উপাখ্যান

সোহরাব হাসান

॥এক॥

পার্বত্য চট্টগ্রামের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে কয়েকজন ইউরোপীয় গবেষক-পণ্ডিত লিখেছিলেন- Life is not ours, অর্থাৎ পার্বত্য চট্টগ্রাম আর সেখানকার আদিবাসীদের হাতে নেই। নিজ দেশে তারা পরবাসী। জমি, ব্যবসা-বাণিজ্য বেশিরভাগই দখল করে নিয়েছে, নিচ্ছে সমতলের বাঙালিরা। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর দেশে-বিদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। পশ্চিমা বিশ্ব এ বইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ-দুর্দশা সম্পর্কে সাম্যক অবহিত হয়। প্রতিকার দাবি করে।

সরকারি চাকরিতে বহাল থাকতেই শরদিন্দু শেখর চাকমা এক বাঙালি সহৃদয়ের সহযোগিতায় বইটি দেশে পুনর্মুদ্রণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বইয়ের ছাপার কাজও শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকারের গোয়েন্দা সংস্থা সব কপি বাজেয়াপ্ত করে, যদিও Life is not ours-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়নি। শরদিন্দু শেখর চাকমা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও অতিরিক্ত সচিব। আদিবাসীদের মধ্যে প্রশাসনে সর্বোচ্চ পদের অধিকারী। বাঙালি হলে পূর্ণ সচিব হয়েই অবসর নিতেন। সাবেক রাষ্ট্রদূত বা সচিব- এটি তার একমাত্র পরিচয় নয়। নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষা এবং জনহিতে নিবেদিত মানুষ-শরদিন্দু শেখর চাকমা। সংক্ষেপে এসএস চাকমা। পাহাড়ীদের কোন সুসংবাদ যেমন তাকে আনন্দিত করে তেমনি দুঃসংবাদে বিচলিত হন। বাঙালি সুহৃদ-সতীর্থদের নিয়ে ছুটে যান রাঙ্গামাটি, বান্দরবান কিংবা খাগড়াছড়ির প্রত্যন্ত অঞ্চলে। এসএস চাকমার সঙ্গে পরিচয় নব্বই দশকের মাঝামাঝি, লেখালেখির সুবাদে। সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পর তিনি পত্রিকায় লেখালেখি শুরু করেন। প্রধানত নৃতাত্ত্বিক

এর আগে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে থাকতেন ঢাকা হলে। হলটিতে তখন সব ধর্ম ও গোত্রের ছাত্ররা থাকত। কসমোপলিটান ছাত্রাবাস। জগন্নাথ হল প্রতিষ্ঠার আগে হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্ররা সেখানে অবস্থান করত। আমাদের অনেকেরই অজানা যে, ঢাকা হলের (পরবর্তীকালে শহীদুল্লাহ হল) কসমোপলিটান চরিত্র বজায় রাখতে ছাত্ররা অনশন ধর্মঘট পর্যন্ত করেছিল। এখনও কি সেখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ ছাত্ররা থাকতে পারে?

চাকরির কারণে এসএস চাকমাকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরতে হয়। ঠাকুরগাঁও থেকে কক্সবাজার কিংবা সিলেট থেকে ঢাকা। প্রশাসনে একজন সৎ ও যোগ্য কর্মকর্তা হিসেবে সুনাম অর্জন করার পরও তিনি সময় মতো পদোন্নতি পাননি; চাকরির শেষ প্রান্তে অতিরিক্ত সচিব থাকাকালেও তাকে কোন বিভাগ বা অধিদফতরের দায়িত্ব দেয়া হয়নি। বিসিএস একাডেমির প্রধান হিসেবেই তাকে অবসর নিতে হয়। যখন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে ধরনা দিয়েও পদোন্নতি পাচ্ছেন না, তখন সহপাঠী বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে এসএস চাকমা বলেছিলেন, আমি তো তোমার মতো মুসলমান নই, 'তাই কিভাবে পদোন্নতি হবে।'

প্রশাসনের মাঠপর্যায়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে ছিলেন এসএস চাকমা। স্বাধীনতার পর ঠাকুরগাঁওয়ের এসডিও হয়েছিলেন; তখন দেশের টাল-মাটাল অবস্থা। শরণার্থী পুনর্বাসন সমস্যা, বিহারীদের নিরাপত্তা সমস্যা, খাদ্যাভাব, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি, চোরাচালান—হাজারও সমস্যা মোকাবেলায় আগ্রাণ চেষ্টা করেছেন। একদিন অফিসে কাজ করতে গিয়ে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান। চিকিৎসক বলেছেন, পুষ্টির অভাব। পাঠক ভাবুন একবার, একজন মহাকুমা প্রশাসক পুষ্টির অভাবে ভুগছেন! এসএস চাকমা লিখেছেন, তিনি এবং পরিবারের সদস্যরা তখন দু'বেলা রুটি ও একবেলা ভাত খেতেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা হেদায়েতুল ইসলাম সার্টিফিকেট দিয়েছিলেন যে, ঠাকুরগাঁওয়ে এ পর্যন্ত যত এসডিও এসেছেন, তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন এসএস চাকমা। সাংসদ নূরুল ইসলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, বিদেশে রাষ্ট্রদূত করার সুপারিশ নিয়ে, কিন্তু তিনি যাননি। অর্পিত সম্পত্তি আইনের অপব্যবহার সম্পর্কে এসএস চাকমা লিখেছেন— 'একজন হিন্দু পাসপোর্ট করে, ভিসা করে চিকিৎসা এবং অন্য কোন কারণে ভারত গেছে। কিছুদিন পর ভারত থেকে ফেরত এসে দেখে তার সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হয়ে গেছে। সে তখন একেবারে পথের ফকির।' এ অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ আমলের। আইনের খোলস পাল্টালেও চরিত্র বদলায়নি। পাকিস্তান আমলের কথা বলতে গিয়ে তিনি আরও লিখেছেন— '১৯৬৪ সালে মোনায়েম খাঁর প্ররোচনায় সারাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে ব্যাপক হারে হিন্দু ও বৌদ্ধরা দেশ ত্যাগ করে। শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট শ্রীমাবো বন্দরনায়েকে কড়া ভাষায় পার্বত্য চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদ জানান। যুগ্ম সচিব ইয়াজদানি মালিক রাঙ্গামাটিতে গিয়েছিলেন ঘটনা তদন্ত করতে। ১৯৬৬ সালে আইউব চীন সফরে গেলে ফজলুল কাদের চৌধুরী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হয়েই নির্বাহী আদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিশেষ মর্যাদা খারিজ করে দেন।

এসএস চাকমা যখন রাঙ্গামাটির এসডিও, হায়দার আলী তখন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা

প্রশাসক। পাহাড়িদের প্রতি সহানুভূতিশীল। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও অফিস-আদালত প্রতিষ্ঠা পায় তার আমলেই। অবশ্য এসএস চাকমার পদোন্নতি না হওয়ার আরেকটি কারণ ছিল তার সম্পর্কে সরকারের সন্দেহ-সংশয়। প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিদের কেউ কেউ মনে করতেন, শান্তি বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে তার যোগাযোগ আছে। যদিও তিনি শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র পথের বিরোধী ছিলেন। মনে করতেন, সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হওয়া সম্ভব। অন্যদিকে শান্তি বাহিনীও তাকে বিশ্বাস করত না। শেখ হাসিনার আমলে তাকে শান্তি উদ্যোগ সংক্রান্ত কমিটির সদস্য করা হলে শান্তি বাহিনীর নেতারা আপত্তি জানান।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের দ্বিধাঘন্ব সম্পর্কে এসএস চাকমা আগেও লিখেছেন, এ বইয়েও উল্লেখ করেছেন। তার ভাষ্যমতে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন জেলা প্রশাসক এইচটি ইমামের অসহযোগিতার কারণেই চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়সহ (তিনি তখন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্যও) অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি। তার মাধ্যমেই পাহাড়িরা আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে ত্রিদিব রায় যুদ্ধের সফলতা সম্পর্কেও সন্দেহান ছিলেন। এ কারণেই তিনি বিজয়ের প্রাক্কালে পাকিস্তানে চলে যান। এ বইয়ে কেবল পাহাড়িদের সুখ-দুঃখের কথা নেই, আছে সুহৃদ বাঙালিদের ঔদার্য ও মহানুভবতার কথাও। যখনই লেখক কোন সংকটে পড়েছেন, তিনি বাঙালি বন্ধুদের কাছে গিয়ে পরামর্শ নিয়েছেন; তারাও সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে কর্মস্থল কক্সবাজার ছেড়ে সপরিবারে তিনি তার অফিসের পিয়ন খলিলের গ্রামের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৬ ডিসেম্বরের পর তার সহায়তায় আবার কক্সবাজার ফিরে আসেন। এসএস চাকমা চাকরি জীবনে রাজমাতা বিনিতা রায়ের একান্ত সচিব হওয়া একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা; তার নিজের জন্য নয়, পাহাড়িদের জন্য। রাজমাতাকে দিয়ে তিনি আদিবাসীদের অনুকূলে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নেয়াতে পেরেছিলেন। আগে আদিবাসীদের চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি ছিল না; রাজমাতাই সেটি চালু করেছেন। ১৯৯১ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আসনই পায় আওয়ামী লীগ। যদিও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার ব্যাপারে দলের সুনির্দিষ্ট কোন অঙ্গীকার ছিল না। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টি যোগ করা হয় এসএস চাকমার আশ্রয় ও পরামর্শে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের পেছনেও তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। সরকার ও জনসংহতির সঙ্গে তিনিই সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেছেন। ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি-জামায়াত জোটের বিজয়ে পাহাড়িদের মধ্যে যে আশা জেগেছিল, তার অনেকটাই তিরোহিত হয়। যদিও এসএস চাকমা মনে করেন, পাহাড়িদের বিপর্যয়ের পেছনে পাহাড়ি নেতাদের হঠকারিতা ও সুবিধাবাদিতাও কম দায়ী নয়। তবুও হতাশ নন এসএস চাকমা। তিনি মনে করেন, পাহাড়ে একদিন সঠিক নেতৃত্ব আসবে, সুমতি হবে রাষ্ট্র চালকদেরও। ইউরোপীয় গবেষক-পণ্ডিতরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের জীবনকে Life is not ours বলে শনাক্ত করেছিলেন। এসএস চাকমার জীবনাভিজ্ঞতা এবং প্রত্যয় সেই ধারণাকে নাকচ করে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে উচ্চারণ করেছে—‘জীবন আমাদেরই’।

কেন প্রতিবিপ্লবী হলাম ?

অনিল চাকমা (গোর্কি)

প্রথমে বলে রাখছি যে, আমি কোনো সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক কিংবা লেখক নই। জীবনে এই প্রথম লিখতে যাচ্ছি। আসলে আমার লেখার ইচ্ছা ছিল না, কারণ জনসংগঠন করার অভিজ্ঞতা থাকলেও লেখালেখিতে আমি মোটেও অভ্যস্ত নই। কিন্তু এই লেখাটি তথাকথিত বিপ্লবী, শুধু বিপ্লবী কেন, সাচ্চা বিপ্লবী হিসেবে নিজেদেরকে দাবী করে বসেন-ওদের কারণে লেখতে বাধ্য হয়েছি। বিপ্লবীর ছদ্মাবরণে প্রতিবিপ্লবীর কদর্যতা কাদের বেশী রয়েছে এবং সত্যিই কারা বেশী অনুশীলন ও প্রয়োগ করছে তা উন্মোচন হওয়া প্রয়োজন এই বোধ থেকেই লেখাটি তৈরি করতে উৎসাহিত হয়েছি। আলোচনা করতে গিয়ে আমার এই লেখায় অহরহ ভুল থাকবে-এই অক্ষমতার জন্য সম্মানিত বিজ্ঞ পাঠকদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। কেন প্রতিবিপ্লবী হলাম-এই কথাটি অবতারণা করতে গিয়ে আমায় একটু পিছনে ফিরে যেতে হবে। আশা করি আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে না এবং আমার সাথে থাকবেন।

বিশাল রাজনৈতিক ভাণ্ডারের আমার জানা ও বোঝা খুবই সীমিত। পড়াশুনাও খুব একটা করেছি এই দাবীও রাখতে পারি না। ফলে যৎসামান্য লব্ধজ্ঞানে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের বিষয়ে তদুত্তর আলোচনা আমি জেনে-শুনে এড়িয়ে গেলাম। তবে আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনাবহুল বহুকাহিনী আর এর সাথে নিজের সরাসরি সম্পৃক্ততা আমার এই লেখার বিষয়বস্তু। সাধারণতঃ সমাজকে যারা আমূল পরিবর্তন করতে চায়-তারা বিপ্লবী। অন্যদিকে এদের বিপরীতে যাদের অবস্থান তাদেরকে প্রতিবিপ্লবী আখ্যায়িত করা হয়।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে মধ্যবিস্ত গরীব ঘরের সন্তান। গরীব পরিবারের যা অবস্থা,

সেইরকম অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমি বড় হয়েছি। পরিবারের একটা আমূল পরিবর্তন আজন্ম থেকে চেয়ে আসছিলাম। বড় যখন হচ্ছি, প্রথমে পরিবার, পরে সমাজ, সর্বশেষ দেশের আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবতে শুরু করি। মনের অজান্তে আমিও সেই কখন থেকে সামগ্রিক আমূল পরিবর্তনের পক্ষে দাঁড়িয়ে গেলাম।

‘৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমি ছোট হলেও বুঝতাম। তাই পাঞ্জাবী সৈন্যদের আগমন, মিজোরামের মিজোবিদ্রোহীদের বিচরণ, ভারতে বাঙালী শরণার্থীদের গমন, সর্বশেষ মুক্তিফৌজ বা মুক্তিবাহিনীদের আনাগোনা এ সব আমার মনে টুকটাক রেখাপাত করা শুরু করলো। আমার পিতামহ (আজু) চাকমা রাজার কর্মচারী হওয়ার সুবাদে তখনকার সময়ে পাঞ্জাবীসেনা, মিজো, বাঙালী শরণার্থী কিংবা সর্বশেষ মুক্তিবাহিনী সবাই আমাদের বাড়ীতে উঠতো। বিরাট গুদাম ঘর তাদের কাছে ছেড়ে দিয়ে আমরা নিকটাত্মীয়দের বাড়ীতে উঠে যেতাম। সবকিছু আজু সামাল দিতেন। মুক্তিবাহিনীর বহু আহত সদস্যদেরকে সেবা-শুশ্রূষা করতে দেখেছি। প্রয়োজনীয় সকল সাহায্য-সহযোগীতা করতে দেখেছিলাম। আমাদের এলাকায় বেত্তোয়াছড়ি নামক স্থানে একটি বিরাট মুক্তিবাহিনী ক্যাম্প ছিল। যুদ্ধের সময় বাঙালীদের সাথে আমাদেরও অনেক চাওয়া-পাওয়া ছিল। অনেক পাহাড়ী যুবক সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। দেশ স্বাধীন হলো, আমরাও জয় বাংলার শ্লোগান দিলাম। কিন্তু স্বাধীনদেশে প্রথম মোহ ভেঙ্গে গেলো যখন মানিকছড়ির যোগ্যাছোলা, বড়কালাপানি এবং রামগড়ের ফেনী-তাইনদং এলাকায় মুক্তিফৌজ ও সাধারণ বাঙালীদের দ্বারা নিরীহ পাহাড়ীদেরকে তাদের বাসভূমি থেকে জোড়পূর্বক উচ্ছেদ, বসত ভিটা ও ধান্যজমি দখল করে নেয়া হলো। এসব পরিবারগুলো আমাদের এলাকায় আশ্রয়গ্রহণ করলো। পাহাড়ী সমাজ জীবনে সত্যিই এই ঘটনা একটি বড় ধাক্কা।

স্বাধীনতার পর আবার সশস্ত্র ডাকাতদের তাণ্ডবলীলায় পাহাড়ীদের সমাজ জীবন এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল। কখনও কখনও ভাত খাওয়া অবস্থায় ভাতের থালা নিয়ে জঙ্গলে পালিয়েছিলাম। বহু রাত জঙ্গলে কাটাতে হয়েছিল। ঘোর অন্ধকার রাতে জঙ্গলে খোলা আকাশের নিচে এক জায়গায় জড়ো হয়ে শিশু ও নারীদেরকে এক পাশে রেখে, বয়স্কদের মধ্যে কি যেন ফিসফাস কথাবার্তা চলতো, যা আমাদেরকে গভীর উদ্বিগ্ন করে তুলতো। বিবস্ত্র করে গায়ে আগুন লাগিয়ে ডাকাতি করার ঘটনাগুলো গ্রামের সাধারণ জনগণের জীবনকে চরমভাবে বিপর্যস্ত করে দিতে শুরু করে।

এমনি এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হঠাৎ একদল সশস্ত্রহাতির আগমন। দেখতে প্রথমে ঐ ডাকাতদের মত মনে হলেও আসলে অশান্তির মাঝে শান্তির শ্লোগান দিয়ে তারা নিজেদের ভিন্নতা জানান দিল। এ যেন প্রখর রৌদ্র খরায় এক পশলা বৃষ্টি। বিজয় সিংহ চাকমা ঐ দলের কমান্ডার। তখনকার সময়ে আমার তার নাম জানা না থাকলে পরবর্তীতে বয়স্কদের কাছ থেকে নামটা জেনে নিয়েছি। কীভাবে পাড়ার শৃংখলা রাখতে হবে, ডাকাতদের কাছ থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যাবে, সেগুলো সহ বিভিন্ন দিক নির্দেশনা নিয়ে জনসাধারণের

সাথে এই সশস্ত্র গ্রুপটি আলোচনা করতে লাগলো। পার্বত্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রাথমিক পর্বের যাত্রাটি যে শুরু হয়ে গেছে সেই বার্তাটি আমাদের মত ছোট বয়সীদেরকে যথেষ্ট উত্তোলিত করে তুলেছিল। আমাদের আর ডাকাত-সন্ত্রাসীদের ভয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে না। বই হাতে নিয়ে মরাচেসী অথবা মুক্তাছড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে যেতে পাবো। শ্রদ্ধেয় সৈয়দ আহম্মদ স্যারের হাত থেকে পড়া বুঝে নেবো। খেলাধুলা করবো, আনন্দ করবো, নির্ভয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়াবো।

দিন যায়, মাস যায়, বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। আমিও বালক থেকে কিশোর তারপরে যুবক। শান্তির মিছিলে মানুষ দলে দলে ভিড়তে শুরু করলো। এই শান্তি'র কথাটি মানুষের কাছে ব্যাপক পরিচিতি হওয়ায় সম্ভবত জেএসএস নেতৃত্ব সশস্ত্র শাখাটির নাম শান্তিবাহিনী রেখেছিল। আমাদের এলাকা শান্তিবাহিনীর অবাধ বিচরণক্ষেত্র হয়ে উঠলো। তাদের পদচারণায় আমাদের বাড়ীটি সবসময় সরগম থাকতো। আমাদের এক নিকটাত্মীয় শ্রদ্ধেয় হরিন্দ্র লাল চাক্‌মার (শুকোবাপ নামে পরিচিত ছিলেন) তাঁর সেবো ছেলে পদ্মাসেন চাক্‌মা ঔরফে প্রতাপ '৭৪-এ শান্তিবাহিনীতে যোগদান করলে তাদের সাথে আরো বেশী ঘনিষ্ঠতা বেড়ে যায়। তাই অতি কাছে থেকে সকল কিছু দেখেছি, জেনেছি এবং বুঝেছি।

এইভাবে পাহাড়ীদের সমাজ জীবনে নীরব বিপ্লব ঘটে যাচ্ছিল। আর এই বিপ্লবে আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন সবাই জড়িয়ে গেলাম। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য-সহযোগীতা ব্যক্তিগত ভাবে আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করতো। বিনিময়ের আশা না করে সব সময় দেয়ার মানসিকতা সর্বক্ষণ কাজ করতো। সমাজে গোষ্ঠীর বিভাজন, আন্তঃজাতিসত্তা সমূহের বিভাজন, ক্ষয়িষ্ণু সামন্তব্যবস্থা যেখানে সমাজকে অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছিল, সেই জায়গায় এই শান্তিবাহিনীর আন্দোলন ও সংগ্রামের ফলে অন্যকিছু বাদ দিলেও শিক্ষার হারটি দ্রুত অগ্রগতি লাভ করেছিল।

শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র আন্দোলন যখন তুঙ্গে সেই সময়ে বাংলাদেশ সরকার সেনাবাহিনী নামিয়ে “কাউন্টার ইন্টারজেন্সি” নামে বিদ্রোহ দমন শুরু করে। সশস্ত্র আন্দোলন ও বিদ্রোহ দমন এই দুইয়ে মিলে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ীদের সমাজ জীবনে এক দুর্বিষহ অবস্থা নেমে আসে। সেই ঝড়-ঝঞ্ঝা আমাদের পরিবারের উপরও যথেষ্ট পরিমাণে বয়ে গিয়েছিল। আমরা গ্রামে বাস করি, তাও খুবই পশ্চাৎপদ এলাকায়। তাই সবদিক থেকে আমরাই বেশী ভুক্তভোগী ছিলাম। পরবর্তীতে শান্তিবাহিনীর গৃহযুদ্ধ, মহান নেতা এম. এন. লারমা তাঁর সহকর্মীসহ শহীদ হওয়ার ঘটনা ও লাম্বা—বাদী টানাটানি সে এক কঠিন অবস্থা। শহরে বড় হলেতো এসব আর বুঝার কথা নয়।

১৯৮৫ সালে এইচ. এস. সি পরীক্ষা দিয়ে আমাদের এলাকায় এক মেম্বারের বাড়ীতে প্রাইভেট টিউশনি করতে গিয়ে মাস দু'য়েক পরে উল্টাছড়ি নামক এক আর্মী ক্যাম্প থেকে ৪০ ই বেসল-এর ক্যান্টেন সাইদ তার ক্যাম্প ডেকে নিয়ে যায়। পৌছামাত্রই হাত-পা ও চোখ বেঁধে দেয়া হয়। তারপর তথ্য ও অস্ত্র খোজার নামে টানা একমাস সাতদিন ধরে যে

অমানুষিক কায়দায় নির্যাতন চালানো হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনার অযোগ্য। খাওয়ার সময়ও চোখ খুলে দেয়া হত না। একমাস সাতদিন পর স্থানীয় মেম্বার ও হেডম্যানদের হেফাজতে আমাকে মুক্তি দেয়া হয়। আমার সাথে আরো ৬ জন বন্দী ছিল। মুক্তি পাওয়ার পর ঐ ক্যাম্প কমান্ডার শান্তিবাহিনীর বিপক্ষে কাজ করার জন্য অনেক লোভনীয় প্রস্তাব বার বার আমার কাছে পাঠানো শুরু করলো। কিন্তু আমি রাজী হইনি।

১৯৮৯ সালে আমাদের এলাকায় উপজেলা চেয়ারম্যান হওয়ার সুযোগ গ্রহণ না করা, প্রেসিডেন্ট জেনারেল এরশাদ কর্তৃক পার্বত্য অঞ্চলে বেকার যুবকদের জন্য বরাদ্দকৃত প্রায় ১,৮০০ টি চাকুরীর যে কোন একটি'রও সুযোগ গ্রহণ না করা— এই অপরাধে ৯০ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ২ই বেঙ্গলের এক মেজর ও ক্যাপ্টেনের নেতৃত্বে আমাদের বাড়ী সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয়া হয়। পুরোপরিবার যাযাবর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হলেও সেই দুঃসময়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইনি। আবার '৯১ সালে ০৩ জুলাই ৫ই বেঙ্গল মেজর সামস-এর নেতৃত্বে গ্রেফতার করে টানা ৯ মাস ২০ দিন আটক রাখা, তারপর রাঙামাটি রিজিয়ন কমান্ডার কর্ণেল আহসান আমিন তাঁর রুমে ডেকে নিয়ে একান্ত আলাপে আমার কাছে দুটো প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। এক. শান্তিবাহিনীর বিপক্ষে কাজ করে ভালো পোষ্টে ও ভালো বেতনে একটি চাকুরীসহ ~~রাঙামাটি~~ শহরে পুনর্বাসনের সুযোগ গ্রহণ করা, দুই. নতুবা কারাগারে যাওয়া। ~~আমি~~ কারাগারে যাওয়াকেই সর্বোত্তম বলে বিবেচনায় আনলাম। তারই সূত্র ধরে তিনটি বছর অন্ধকার কারাগারকোটে অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

জেল থেকে মুক্তি পাবার পর সমীরণ'দার সাথে পূর্ব পরিচিতির জের ধরে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে আবারও নিজেকে জড়িয়ে ফেলি। আমাদের এলাকার থানা কমিটির পাহাড়ী গণপরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্বপালনকালীন সময়ে পার্বত্যচুক্তি হতে যাচ্ছে এধরনের কথাবার্তা কানে আসতে থাকে। পাহাড়ী ছাত্রপরিষদ, পাহাড়ী গণপরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন এই তিনসংগঠনের মধ্যে আসন্ন চুক্তিকে উপলক্ষ্য করে বিভাজন শুরু হয়ে যায়। সমীরণ'দাকে অনুসরণ করায় চুক্তির বিপক্ষে আমার অবস্থান নির্ধারণ হয়। সেই থেকে প্রসীত বিকাশ খীসার কাছাকাছি আসা এবং পরে তার অতিঘনিষ্ট হয়ে উঠা। এখানে বলে রাখা ভালো যে, সমীরণ'দাকে অনুসরণ করার অন্যতম কারণ ছিল নতুন পার্টি ইউপিডিএফ প্রতিষ্ঠালগ্নে যারা জড়ো হয়েছিলাম তাদের মধ্যে শুধু আমরা দু'জনই বিবাহিত ছিলাম। কিন্তু ইউপিডিএফ এর প্রস্তুতি সম্মেলনের আগেই সমীরণ'দা নিক্রিয় হয়ে যান। এ সময় আমি সমীরণ'দাকে প্রশ্ন করেছিলাম “কেন দা আপনি (সমীরণদা) সরে যাচ্ছেন? আমি তো পরিবারওয়ালা হিসাবে আপনাকেই অনুসরণ করে আসছি।” সেদিনের অনেক কথার মধ্যে কিছু কথা এখন মনে পড়ছে। তিনি বললেন যে “প্রসীতবাবু অন্ধ ও বধিরদের কথা অধিক শুনেন এবং বিশ্বাস করেন। পুলক, সমারী, পুতুলী ও উজ্জ্বল স্মৃতিদের কথায় পরিচালিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আমাকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেন। কাজেই আমার পার্টিতে থাকা না থাকা একই ব্যাপার।” চুক্তির অল্প কিছুদিন পর তিনসংগঠন কর্তৃক একটি জরুরি বিবৃতি বুকলেট আকারে প্রকাশিত হয়েছিল। এই

বুকলেটে জনসংহতি সমিতির সভাপতি জ্যোতিরিন্দ্র বোধপ্রিয় লারমা'কে (সম্ভব লারমা) চুক্তি সম্পাদনকারী হিসেবে দায়ী করে যে ভাষায় তাঁকে আক্রমণ করা হয়েছে, তাতে সমীরণদা আপত্তি জানান। বুকলেটটি বের হওয়ার আগে খসড়াটি সমীরণ'দাকে দেখানো হয়নি। যদি শুরুতে এই অবস্থা হয় তাহলে আগে থেকে সরে দাঁড়ানো ভালো হবে বলে সেদিন তিনি মন্তব্য করেছিলেন।

তারপর প্রসীতবাবু ও রবিশংকরবাবুর বক্তব্য শুনলাম। সেদিন তারা বললেন যে, “সমীরণবাবুর পেটিবুর্জোয়া চরিত্রটি উন্মোচন হয়েছে, তিনসংঠনের সম্পত্তিগুলো দখল করে ভোগ করার উদ্দেশ্যে সরে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি যা বলছেন এবং করছেন তা সবই উজানী মার (সমীরণদার স্ত্রী) কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে করছেন”। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাগ্যাহত মানুষের অধিকারের জন্য রাজনীতিতে নেমেছিলাম আবার ফিরে যাবো তাহা হয়না, সেই চিন্তা থেকে সমীরণ'দাকে অনুসরণ না করে মি: প্রসীত এবং রবিশংকরকে অনুসরণ করতে লাগলাম। তারা উভয়ে যা নির্দেশ, আদেশ করছেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যাচ্ছিলাম। যে সময় মানুষ ঘর-সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকে সেই সময় বর্মাছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ ইস্তফা দিয়ে দেশ ও জাতির জন্য ইউপিডিএফ রাজনীতিতে নিজেকে সমর্পণ করলাম। পার্টি প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর আমার এলাকায় প্রথমেই ২০টি গ্রামে ভিলেজ কমিটি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ছোটকাল থেকে জেএসএস আন্দোলনের সাথে যোগাযোগ থাকা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়া, শিক্ষকতা করা এ সব মিলিয়ে প্রায় সময় জনতার কাতারে ছিলাম। তাই যখনই আহ্বান করেছি শিশু, কিশোর, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই আমার আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। এটা আমার বড় প্রাপ্তি। তাছাড়া জনসাধারণের সুখে-দুঃখে হীতকর কর্মে আমার সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সবসময় ছিল। আমি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলতে পারি যে, আমার এলাকাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে যে অঞ্চলে কাজ করেছি, যেখানে গেছি সেখানে জনগণের ক্ষতিকর কোনো কাজ আমি করিনি। ইউরোপের হাঙ্গেরীতে যাওয়ার ভিসা পাওয়ার পরও জনতার টানে সে সময় যাওয়া হয়নি।

আমি যতক্ষণ প্রসীতবাবুর কথা শুনেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো ছিলাম, বড় ত্যাগী নেতা এবং বিপ্লবী ছিলাম। কিন্তু যখন জনগণের ভালো কাজ করতে গিয়ে তার চারপাশে পরিবেষ্টিত থাকা ভীরা টাইপের অকর্মণ্য, ক্ষমতালোভী, চামচাদের ভর্ৎসনা করা শুরু করলাম, প্রসীত খীসার খামখেয়ালিপনা ও স্বৈচ্ছাচারীতার প্রতিবাদ জানালাম এবং এই সবের প্রতিকার না পেয়ে দল থেকে নিষ্ক্রিয় হলাম সেই থেকে আমি আর বিপ্লবী নই। হয়ে গেলাম প্রতিবিপ্লবী। সমীরণদা যে উপাধি পেয়েছেন সেই উপাধিতে আমিও ভূষিত হলাম। হয়রে বিপ্লব! আমিতো জনসেবা ও জনসংগঠন তৈরি করাই শিখেছিলাম, তোষামোদ ও চামচাগিরি শিখিনি, আর পদলেহন করা তো আমার কল্পনার বাহিরে। তাহলে খাঁটি বিপ্লবী হই কীভাবে? অবশেষে হয়ে গেলাম প্রতিবিপ্লবী। ধন্য হে প্রতিবিপ্লব!

যারা একসময় রাত দিন মদ্য পান করে দিন-দুপুরে হারিকেন জ্বালিয়ে উলঙ্গ হয়ে পাড়ার এমাপা থেকে ঐমাপা ঘুরে বেড়াতো তারা এখন বিপ্লবী। শ্রীকৃষ্ণর মত (যে শ্রীকৃষ্ণকেও হার মানায়) হাতে বাঁশ নিয়ে তিন-চারজন নারীর সাথে জড়াজড়ি করে খাগড়াছড়ি বাজারে

শত-হাজার মানুষের সামনে যে ব্যক্তিটি ঘুরে বেড়াতো, বাবুছড়া বাজার চৌধুরীর বাড়ীতে মেয়ের বয়সী এক নারী কর্মীকে দুর্বল মুহূর্তে বলাৎকার করার প্রচেষ্টাকারী, চট্রগ্রামে পার্টি বাজেটের টাকা হিসেব-নিকেশ প্রদান করতে ব্যর্থ হওয়া-সেই ধ্রুবজ্যোতি চাকমা এখন ঋণটি বিপ্লবী। দলের আরেক প্রভাবশালী নেতা গিরিফুলে একমেয়েকে অন্তঃসত্ত্বা করে দেয়ার পরও যে বিয়ে করেনি, যৌথখামার ১নং রাবার বাগানে এক গৃহিণীর সাথে দিন-দুপুরে আপত্তিকর অবস্থায় ধরা পড়ে, ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে কাজ করার প্রাক্কালে এক নারীকর্মীর সাথে বারবার আপত্তিকর অবস্থায় ধরাপড়ার পর সেই নারীকর্মীকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা এবং লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎকারী সেই প্রদীপন খীসা গোর্কির মত প্রতিবিপ্লবী হবে কেন?? সেইতো ধ্রুবজ্যোতি, আনন্দ প্রকাশ চাকমা(কঠ), রুইখই মার্মা (অংসাইন/কোয়াং), উজ্জ্বলশ্রুতি চাকমা (পাহু), রঞ্জনমনি চাকমা (জেনিথ) ও কালোপ্রিয় চাকমাদের (অতুল) মতো প্রসিদ্ধ খীসার কাছে সোনার চেয়ে ঋণটি বিপ্লবী। কথায় আছে রতনে রতনকে চেনে। আর এই রতনদের ব্যাপারেও অনেক কাহিনী আমার কাছে জমা রয়েছে। ২০০৪ সালে জানুয়ারী মাসে খাগড়াছড়ির জেলা কমিটি ফোরামে প্রদীপ চাকমা (বিশাল) নামে একবন্ধু আক্ষেপ করে বলেছিল—‘এখন পার্টিতে যা অবস্থা এক নেতা আরেক নেতার বিরুদ্ধে অসংলগ্নভাবে প্রকাশ্যে যত্রতত্র কথা বলা শুরু করেছে, একে অপরকে আক্রমণ করছে, যে ধরনের গ্রুপিং চলছে তাতে আমাদের মত নিরীহ কর্মীরা শক্তিশালী নেতাদের লেজুড়বৃত্তি ও তোষামোদ করা ছাড়া পার্টিতে টিকে থাকা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে।’ তিনি ঠিকই শক্তিশালী নেতাদের লেজ ধরতে পেরেছেন। তা না করে যদি গোর্কিকে ধরে থাকতেন তাহলে অরুন চাকমা (কাহু), উত্তম দেওয়ান(এন ডি/ ইগো), সুকুমার চাকমা (দিগন্ত), জয় মোহন চাকমাদের (পরেশ) মত তাকেও প্রতি বিপ্লবী বলে ঘোষণা করা হতো।

শীর্ষ নেতার লেজুড়বৃত্তি ও তোষামোদ যদি নেতা হবার যোগ্যতার মাপকাঠি হয়, বিপ্লবী হওয়া যায় তাহলে জাতির ভাগ্য খুবই সুপ্রসন্ন (!)। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও নারী কেলংকারী যতই ঘটুক না কেন—তাতে কিছু আসে যায় না। চামচারা ঠিক থাকলে নেতা সম্ভ্রষ্ট থাকবেন, তাতে জেএসএস দ্রুত নির্মূল হবে, একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে—এটাই হচ্ছে ইউপিডিএফ এর বর্তমান বিপ্লবী দর্শন। আর প্রতিবিপ্লবী সঞ্চয়, অভিলাষ, দীপায়ন, দীপ্তি ও গোর্কি এরা পালিয়ে যাবে কোথায়? বিপ্লব নেতারা অশুদ্ধ নেতাদেরকে পিষ্ট করে ছাড়বে। তারই প্রাথমিক পর্ব হিসেবে কর্মী ও জনমনে বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রচারণা চালিয়ে প্রতিবিপ্লবীদের খুঁটি নড়েবড়ে করে দেওয়ার একটা প্রচেষ্টা ইউপিডিএফ চালিয়ে যাচ্ছে। বিপ্লবী বিপ্লবীদের ভয়ে সাধারণ মানুষ এতই তটস্থ থাকেন যে—একটু অপরাধই (?) মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।

এই বিপ্লবী বিপ্লবীরা আমার এলাকার জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করেছে, যে লোক গোর্কির সাথে দেখা করবে, কথাবার্তা বলবে তাকে ৫লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে নতুবা প্রাণদণ্ডের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এভাবে এখন বহুজনকে হয়রানী করা হচ্ছে। এলাকার কিছু ডাকাত ও বাটপার তাদের দলে জুটেছে। তাদের কথায় সবকিছু পরিচালিত

হচ্ছে। রুইখই (কোয়াং, অংছাইন) মার্মা যে একসময় প্রীতিগ্রন্থ হয়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, আনন্দ প্রকাশ চাক্মা (কঠ) প্রয়াত মহান নেতা এম.এন. লারমার খুনিদের একজন সক্রিয় সদস্য (এটা গর্বভরে আমাদের সামনে বলতেন।)—এরাই এখন ইউপিডিএফ দলটির হর্তাকর্তা। কাজেই গোর্কিকে যে বেশী অশ্রাব্য ভাষায় আক্রমণ করতে পারছে, (এটা শুধু কর্মীবাহিনীর ভিতর নয় জনসাধারণের মধ্যেও এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে) গালি দিতে পারছে এবং যাহা করেনি তাহা বানিয়ে দুর্নাম রটিয়ে যত্রতত্র বলে বেড়াচ্ছে তারাই এখন দলটির সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাবান। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও নানা কেলিংকারী করেও যদি একবার গোর্কিকে গালি দেয়া যায় তাহলে সকল অপকর্মগুলো জায়েজ হয়ে যায়। নীরবেই থাকতে চেয়েছিলাম কিন্তু থাকতে দেয়া হচ্ছে না। তাই বিপ্লবীরা চরিত্র উন্মোচন করার একটা প্রয়াস চালাচ্ছি। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইউপিডিএফ প্রধান প্রসীত বিকাশ খীসা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেও সাংসদ হওয়ার খায়েস পূরণ করতে পারেন নি। তাহলে গোর্কির বউ কেন ইউপি চেয়ারম্যান হতে পারবে? ইউপি চেয়ারম্যান হলে সরকারের হয়ে কাজ করবে, দেশ ও দলের ক্ষতি করবে। সুতরাং খাগড়াছড়ি পার্বত্যজেলার একমাত্র মহিলা ইউপি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় গোর্কির বউ দেবরানী চাক্মা মহা অপরাধী হিসেবে ইউপিডিএফ-এর কাছে বর্তমানে চিহ্নিত। অথচ প্রসীত খীসা নিজে এম.পি. না হয়েও বর্তমান বি.এন.পি সরকারের বিভিন্ন সামরিক-বেসামরিক বড় বড় আমলা এবং প্রভাবশালী মন্ত্রী, এম.পি.দের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে যাচ্ছেন। এই সবতো ইউপিডিএফ-এর বিপ্লবমুখী কর্মকাণ্ডেরই অংশ। ঢাকা ও চট্টগ্রাম ছেড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থান করতে প্রসীত খীসার খুবই অনীহা। মাসিক লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করতে পারলে, শহরে বিভিন্ন নামি-দামী রেষ্টোরায়ে ও বিলাসবহুল ফাষ্ট ফুডের দোকানে বসে আড্ডা দিতে পারলে এবং জরুরি কাজ দেখিয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বিমানে চলাফেরা করলে তেমন ক্ষতি নয়। কারণ এইগুলোতো একজন বিপ্লবী প্রকৃত চরিত্র। যত দোষ নন্দঘোষ। তাই গোর্কির বউ দেবরানী চাক্মাকে ঠেকাও। তারপরও লজ্জা-শরমের কথা আছে না? প্রচার করতে হবে—“ইউপিডিএফ নয়, মেম্বার আর স্থানীয় জনগণই দেবরানীকে চেয়ারম্যান হিসেবে দেখতে চাচ্ছে না।” মেম্বারদের ষড়যন্ত্রের কাজ-কর্ম টিলে হলেই ডেকে নিয়ে আরো টাইট দেয়া হয়, জ্বালানী সরবরাহ করা হয়। প্রতিবারই শাসানো হয় ইউপিডিএফ এসব করছে তা কোনো ভাবেই প্রকাশ করা যাবে না। এই চক্রান্ত পুরোপুরি বাস্তবায়ন না হলে ইউপিডিএফ-এর বিপ্লব বিপথে পরিচালিত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা বিদ্যমান। তাই গোর্কি ও তার বেয়াদব মার্মা বৌকে ঠেকিয়ে পুরো পরিবারকে রাস্তায় ফেলে দিতে হবে—এটাই এখন পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের দাবী আদায়ের মূল কর্মসূচী। এই কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়ন হোক। চূড়ান্ত ফলাফল দেখতে আমার মতো অনেক প্রতিবিপ্লবী এখনও বেঁচে আছে, এটাই বিপ্লবীরা বড় অসুবিধা।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়ন সংকট ও সম্ভাবনা

মং শৈ ব্রাই

একটি জাতির সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা চিহ্নিতকরণের মাঝে লুকিয়ে আছে উন্নয়নের চাবিকাঠি। যার জন্য দরকার উন্নয়নের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি। এক্ষেত্রে এমন ব্যক্তিকে খুঁজে বের করতে হবে যার মাঝে ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি লুকিয়ে আছে। দৃষ্টি অনুকূল না হলে তাকে নিয়ে আশা না করায় শ্রেয়। ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গি থাকলে তার মাঝে গতিশীলতা জাগাতে হবে। উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ, কর্মবাস্তবায়নের কৌশল অবলম্বন করা, সর্বোপরি সফল সমাপ্তি টানা। পার্বত্য চট্টগ্রামে অনেক জাতিতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ছড়িয়ে আছে, যেগুলো অনেকাংশে উন্নয়নের সহায়ক কৌশল হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। সমতল অঞ্চলের বসবাসকারী অনেকে মনে করে থাকেন পার্বত্য অঞ্চলের সকল নৃ-জাতিগুলো একই জোটভুক্ত, একই খাদ্যাভ্যাস, একই সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিবেশের মানুষ। তারা পশ্চাদপদ সর্বক্ষেত্রে। পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা বলতে অনেকে চাকমাদের মনে করে থাকেন। তাই আকতারুজ্জামান ইলিয়াসের মত বিশাল মাপের উপন্যাসিকরাও পত্রিকায় নিবন্ধ লিখেন “চাকমা উপন্যাস চাই”। তা না হয়ে মারমা কিংবা ত্রো উপন্যাস চাই শিরোনাম দিয়েও তিনি লিখতে পারতেন। এই কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের কর্মকৌশল তৈরি করার ক্ষেত্রেও চাকমা জনগোষ্ঠীকে ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। যার জন্য উন্নয়নের নামে কোটি কোটি টাকা খরচ করলেও পার্বত্য অঞ্চলে এখনও উন্নয়নের চাবিকাঠি খুঁজে পাওয়া যায় নি। ফলে শান্তিচুক্তি ৭ (সাত) বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনো শান্তির সুবাতাস বয়ে আনতে পারেনি।

যে কোন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রকল্প ধারণার উপর ভিত্তি না করে তার বাস্তব রূপ চিহ্নিত করা জরুরি। পাশাপাশি পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুবিধা বঞ্চিতদের সম্পৃক্ত করা, তাদের সামর্থ্য যাচাই করা এবং প্রকল্প সম্পাদনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছতা বজায় রাখা উচিত।

পিছিয়ে থাকা নৃ-জনগোষ্ঠীগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে মূল ধারার জনগোষ্ঠীর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে জীবন-যাপনের মান উন্নয়নের বিষয়টিও সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদিবাসীদের অন্যান্য ক্ষেত্র যথা : সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও পরিবেশগত মূল্যবোধের বিষয়গুলিও একই সঙ্গে উন্নয়ন সাধন করা উচিত। তার পাশাপাশি সুফলভোগীদের সামাজিক রীতিনীতি ও সংস্কৃতিকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। কেননা ভিন্‌সাংস্কৃতিক পরিচয়ের কারণে আদিবাসীরা অসুবিধার সম্মুখীন বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠী যদি পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয় তাহলে সেই সব জনগোষ্ঠী মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারে। পাশাপাশি উন্নয়ন প্রক্রিয়ার উপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে রয়েছে ১১ (এগারো) সম্প্রদায়, যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব সংস্কৃতি, সামাজিক প্রথা ও ধর্মীয় বিশ্বাস রয়েছে। তাই দেখা যায় চাকমাদের সামাজিক ও পারিবারিক বন্ধন শক্ত হলেও মারমা সমাজে সেটা প্রযোজ্য নয়। আবার বম কিংবা শ্রো সমাজের সামাজিক বন্ধন, ধর্মীয় বিশ্বাস শক্ত হলেও, উভয়ে একই এলাকায় বসবাস করলেও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা এক নয়। বমরা একই পাহাড়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদের ফসল উৎপাদন করতে পারলেও শ্রোরা তা পারে না। শ্রো জনগোষ্ঠী কেবল জুম চাষের মাধ্যমে যা পায় তাতে সন্তুষ্ট। বম আদিবাসীরা জুম চাষের বদলে পাহাড়ে কলা, আনারস, আম, পেয়ারা, পেঁপে, জাম, লিচু, আলু, চাষ করার কারণে বিভিন্ন মেয়াদের সুফল ভোগ করতে পারে। অন্যদিকে অধিকাংশ চাক কিংবা ত্রিপুরা জাতীগোষ্ঠী মনে করে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে শিক্ষা। কেবল শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে উন্নয়নের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। তাই ভৌগলিক পরিবেশ অভিন্ন হলেও আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভিন্ন। উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ সহ সবক্ষেত্রেই ভিন্নতা দেখা যায়। একজন বম অথবা বম মহিলা আনারস কিংবা রাগানের ফলমূল বাজারে বিক্রি করতে আনলে ন্যায্যমূল্য না পাওয়া পর্যন্ত বিক্রি করবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত বাজারসামঞ্জস্য মূল্য হাতে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষায় থাকবে। অন্যদিকে মারমা বা শ্রো সমাজের উল্টো চিত্র। যাহা পায় তাহাই লাভ। তারা সামঞ্জস্যহীন কম দামে উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে। সে কারণে ন্যায্যমূল্য পাওয়া থেকে তারা অধিক পরিমাণে বঞ্চিত হয়। মধ্যস্থত্বভোগী বাঙ্গালী দালাল গোষ্ঠীরা এই সব সুযোগ পেয়ে রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠছে অথচ তারা কোনো উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বহিরাগত এই দালাল গোষ্ঠীরা তৈরি করছে সুউচ্চ অট্টালিকা। তার বদলে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত জনগোষ্ঠীগুলো তংঘর কিংবা সর্বোচ্চ টিনের ছাউনিতে বাস করছে।

অনেকেই শিকার করতে চান না যে এ দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা বা আদিবাসীদের সমস্যাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। তার পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক এটা নির্দিষ্ট বলা যায়। মুষ্টিমেয় বাম রাজনীতিবিদরা আদিবাসীদের সমস্যার পক্ষে গান গায়লেও তাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে অন্য জায়গায়। তাই বিভিন্ন গোল টেবিল কিংবা জনসভা বক্তৃতাতে এ সব নেতারা প্রায়ই বলে থাকেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের মূল জনগোষ্ঠীর (আদিবাসীরা) পাশাপাশি বাঙ্গালী ভূমিহীন উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে। এর পেছনে মূল কাজ করে বাঙ্গালী সম্প্রসারণবাদের ভাবাদর্শ। অথচ তারা মঞ্চে কিংবা জনসভায় নিজেদেরকে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাহির করে।

আদিবাসীরা বাঁচবে ও বাঁচা উচিত। ১৯৮৯ সালে ILO কনভেনশন ১৬৯ নং ধারায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আদিবাসীদের সংগঠনসমূহ সকল উন্নয়ন প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করবে যা তাদের জীবনযাত্রায় প্রভাব বিস্তার করবে। এই কনভেনশনে, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার আগে আদিবাসীদের সাথে আলোচনা আলোচনার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। উন্নয়নে আদিবাসীদের অংশগ্রহণ, সামাজিক নিরাপত্তা, সুস্বাস্থ্য, মানবিক ও পরিবেশ উন্নয়ন যাবতীয় বিষয়সমূহ এই কনভেনশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ঘোষণাটি আদিবাসীদের বস্তুগত উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ।

মূল স্রোতধারার জন্য প্রণীত উন্নয়ননীতি অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসীদের স্বার্থের পরিপন্থী হতে পারে। মূল জনসমষ্টির জন্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের উদ্যোগ আদিবাসীদের সুবিধা ও স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য যে বরাদ্দগুলো আসে তাতে প্রথম অগ্রাধিকার পাওয়ার কথা আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহের। কিন্তু বাস্তবে বেশির ভাগ সুযোগ সুবিধা পায়, বাঙ্গালী ব্যবসায়ী কিংবা রাজনৈতিক নেতাসমূহ।

পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল স্তরে দুর্নীতি নীতিতে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে জেলা পরিষদ এবং পরিষদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এই সব প্রতিষ্ঠানের কোন জবাবদিহিতা নাই। মুষ্টিমেয় অর্থলোভী রাজনৈতিক নেতা এই দুর্নীতিতে জড়িত রয়েছে বলে বারবার পত্রিকায় খবর প্রকাশ হলেও তাদের কোনো মাথা ব্যথা নেই। আর সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুর্নীতি দমন কমিশনও তাদের দুর্নীতির ব্যাপারে কোনো মাথা ঘামান না। দুঃখের বিষয় হচ্ছে পাহাড়ী জনগোষ্ঠী কি চায় বা না চায় সেটা কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে এই সরকারের মনোনীত মুষ্টিমেয় নেতা/নেত্রী দিয়ে এই প্রতিষ্ঠান চলবে, সেই সাথে জাতিকে নিরবে নিভূতে দুর্নীতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার প্রক্রিয়া চালানো হবে। এতে শাসকগোষ্ঠীর শাসন কার্যক্রম আরো সহজ হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা কখনো শাসকশ্রেণীর উপর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। তাছাড়া বর্তমানে রাজনৈতিক নেতা/নেত্রীবৃন্দরা সবই FAX যোগে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। অন্য দিকে সাধারণ জনগণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আশা করলেও সুবিধাবাদী গোষ্ঠীরা তা চাচ্ছে না। তারা মনে করে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের জবাবদিহিতা করতে হয়। তাছাড়া নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতায় নাও যেতে পারে। নেতৃত্বের এই সব নেতিবাচক মনোভাব উন্নয়নের বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে জুমিয়াদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য প্রযুক্তি নির্ভর কৃষি ব্যবস্থাপনাগুলোকে প্রয়োজনবোধে প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শনের উদ্যোগ নিতে হবে। তার পাশাপাশি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উন্নয়ন কর্মীদেরকে কাজে লাগাতে হবে। আদিবাসীদের কৃষি বা জুম চাষের প্রধান উদ্দেশ্য নিজেদেরকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। যার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি উন্নয়নসহ টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন করা সম্ভব। পার্বত্য চট্টগ্রামে চাষ যোগ্য জমির পরিমাণ জনসংখ্যা অনুপাতে খুব কম। পূর্বে যেটুকু চাষাবাস করার জমি ছিল, কাণ্ডাই বাঁধ নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সেই সব জমিও বাঁধের পানির নিচে ডুবে আছে। পরবর্তী সময়গুলোতে আদিবাসীদের উচ্চভূমিতে জুম চাষ ব্যাপক হারে বেড়ে যায়। যদিও জুম চাষ ফসল উৎপাদনের আদিম ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। প্রত্যন্ত অঞ্চলের আদিবাসীরা এখনও মনে করে বর্তমান প্রেক্ষাপটে জুম চাষই

হল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এই পরিপ্রেক্ষিতে জুম চাষের কিছু পদ্ধতিগত পরিবর্তন নিয়ে আসতে হবে। সাধারণ জুম চাষের পাশাপাশি বিভিন্ন ফলজ ও ঔষধি গাছের বাগান সৃষ্টি করতে হবে। এই জন্য জুম চাষীদের সনাতনী ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন দরকার। সরকার ও অন্যান্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকেও উন্নয়নের গতানুগতিক চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। জুমের উৎপাদিত পণ্যসমূহের বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা আরও সহজ করতে হবে। উৎপাদিত কাঁচামাল সংরক্ষণের জন্য ব্যাপক সংখ্যক হিমাগার তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরি। প্রান্তিক জুম চাষী যেন তাদের উৎপাদিত বিভিন্ন মৌসুমী ফল ও অন্যান্য পচনশীল কৃষিজাত পণ্য হিমাগারে সংরক্ষণ করতে পারে সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের অন্যতম বাধা হচ্ছে ভাষাগত সমস্যা। উন্নয়ন সম্পর্কিত অধুনিক জ্ঞান ও তথ্যগুলো উৎপাদনে জড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর জন্য প্রতিটি আদিবাসী ভাষায় সে বিষয়গুলো ভাষান্তর করা দরকার। এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান শেখানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নিতে হবে। উন্নয়নের যে সব বাধা রয়েছে সেই সব বাধা সমূহকে দূর করা দরকার। উন্নয়নের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। যার জন্য দরকার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন সমাজ তৈরি করা। ইতিবাচক দৃষ্টি সম্পন্ন সমাজ ব্যবস্থা উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। সে সব বিবেচনা করে সেই কাজিত উন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো তৈরি করা খুব জরুরি। সেই কাঠামোতে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করা হবে সর্বোত্তম পন্থা। আর এই ধরনের সার্বজনীন উন্নয়ন কাঠামো তৈরি করতে গেলে প্রথমে পার্বত্য অঞ্চলের নৃ-জাতিসমূহের শত বছরের লালিত আদি অভ্যাস বা চর্চা সমূহকে খুঁজে বের করতে হবে। তারা যে সব অভ্যাস, বিশ্বাস চর্চা করে যাচ্ছে, সে সব প্রথা, সামাজিক নিয়ম-কানুন এবং অন্যান্য মিথগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে আধুনিক ধ্যান-ধারণার সাথে সেগুলোকে সম্পৃক্ত করা দরকার। আদিবাসী জনপদে বহু আদিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব রয়েছে। যাদের সাধ আছে, সাধ্য নেই। তারা অক্ষর জ্ঞানহীন হলেও তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান ও সামাজিক রীতি-নীতির উপর যে দখল রয়েছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পর্কিত করতে হবে। প্রথাগত জুম চাষের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য পাহাড়ী এলাকার চাষাবাদ পদ্ধতিকে অনুসরণ করতে হবে। বলা হচ্ছে উচ্চ পাহাড়ে জুম চাষের চেয়ে বহুস্তর পদ্ধতির চাষাবাদ অধিক উপযোগী। পার্শ্ববর্তী নেপাল, ভুটানের মতো পর্বতময় দেশসমূহেও বহু স্তর পদ্ধতি চাষাবাদ অধিকহারে প্রচলন করা হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে উন্নয়নের ক্ষেত্রে জুম চাষের মৌলিক পরিবর্তন কিভাবে হবে তা আরও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের বিষয়। চাপিয়ে দেওয়া উন্নয়ন সেখানকার জীববৈচিত্র্য ও জাতিগত বৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ কিংবা বিকাশের সহায়ক নয়। এ সকল বৈচিত্র্য ধ্বংসকারী উন্নয়ন পরিত্যাগ করলে সে অঞ্চলের পরিবেশ ও অন্যান্য সকল বিষয়ের জন্য মঙ্গলজনক হবে। স্থানীয় জনগণের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সেখানকার সামাজিক কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সময়ের দাবি।

ব্যঙ্গমার ব্যথা ফিস্.ফিস্

ডেভিড স্বজন বিপ্লব

কাছে আসি—বসি ডালে পাতা মাড়াইলে
যদি শব্দ হয়—ডালভারে এ্যাতো পাশাপাশি
তোরে জিগাইলে খালি নাড়ো মাথা না-না
ঝতুরে না-মানা ডালে তা-কি বসা হয় ॥

মানো কি বাসনা—যে-ভারে সমান বসি
দেহে যারে জানাজানি—মুখের না-ফরমানি
কি-সুখে অসুখে কিম্ মাথা তুল্যা
'বসো'—শব্দটারে এ্যাতো কাছে আনা ॥

মাকড়সা

ও বা যে দ আ কা শ

ঠিক ঠিক একটি মাকড়সা মরে আছে এই শহরে। তার
চোখমুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে দীর্ঘ তেত্রিশ বছরের এক সৌর
রশ্মিকণা। আর তার অসংখ্য পায়ের নীচে যে বেলুন ফোলানো
ছিলো, তাকে কনডম ভেবে কেউ কেউ নাকমুখ ঢেকে অদূরে
বাড়িয়ে দিয়েছে গলা। তার চেহারার সৌম্য ক্লান্তি দীর্ঘ মৃত্যুর
পরই সাবলীল হয়ে জ্বলছে। নগরীর প্রাসাদগুলি, তার মুখে ঝুঁকে
পড়ে বলে : তোমার আত্যন্তিক স্নেহে এই দেখো আনত করেছি
মাথা। যারা যারা মদ্য বা ধূমপান করে, তাদের অপবিত্র কণ্ঠ হতে
তার জন্য বর্ষিত হলো আশীর্বাদ। আজ এই মৃত্যুস্নাত ভোরে এ
শহর গুটিয়ে রেখেছে তার পোশাকী সরম। প্রিয় মাকড়সা শাহরিক
সীমান্ত ভেঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছে তার সূক্ষ্ম জটাজাল। কে তাকে
মৃত্যুর মতো ডেকে নিয়ে এলো!

মৃত মাকড়সা চিৎ হয়ে পড়ে আছে শহরের প্রসিদ্ধ প্রাঙ্গণে। তার
রক্তহীন পা, আকাশ বিদীর্ণ করে ভুলে যায় মাটির মুগ্ধতা ॥

চালচিত্র

শ্রাবণী আলম

দ্বন্দ্বময় ভালোমন্দ ভূলে
কাছাকাছি আমরা,
বন্দী বেলি ফুলের মালার
দুঃখের মতই আনন্দ আমাদের।

প্রেম
অসুন্দর নয় বর্ণনায়
তবে একথা নিশ্চিত যে
আমাদের ভালোবাসা হয় না পারম্পরিক
অসুন্দরের গাষ্ট্রীর্ষে ব্যস্ত আমরা
ভালোবেসেছি নিজেদের

এ যাবৎ যা কিছু হলো
তার রূপান্তরে উত্তর—
যা সত্য জেনেছো, তাতে তুমি নিশ্চিত নও
কেবল জেনো-তুমি তোমার নও ॥

অলস দুপুর বিলাপ করতে করতে
ছুটে যায় শহরের এ মাথা থেকে তেমাথা
তার পরও.....
অতীতের সাথেই আমাদের বর্তমান
ভবিষ্যতের পরেই আমাদের অতীত ॥

চেতনার জাহাজ

শরৎ চাকমা

কোথায় নোঙর করিবে চেতনার জাহাজ
চলছে অথৈই সমুদ্রে, লক্ষ্যহীন ভাবে
কতিপয় নাবিক যাত্রীবিহীন চলছে নিরুদ্দেশে
গভীর নিদ্রায় ক্যাপ্টেন—স্বপ্ন বিভোর
অজানায় চেতনার বন্দর, নির্ণয় না জেনে
পৌছতে চায় ফেরেস্তার বেশে, চেতনার দেশের সন্ধানে।

কোথায় নোঙর করিবে চেতনার জাহাজ
মরিচা ধরা ইঞ্জিন, বিদঘুটে শব্দ, বিষাক্ত কালোধোয়া
ক্ষুদ্র ধরিত্রী, বিপন্ন মানবতা
যত ভয় নাবিকদের, যাত্রী বিমুখ ডাক দেয় বার বার।
গভীর নিদ্রায় ক্যাপ্টেন—
স্বপ্নের সংলাপে তার ধ্যানের জয়ধ্বনি
স্বপ্ন ভঙ্গে নব রূপ, হয় বিষাক্ত অত্যাচারী
দলচ্যুত হয় যারা চেতনার কান্দারী।

কোথায় নোঙর করিবে চেতনার জাহাজ
কোথায় সেই চেতনার বন্দর
সূর্য দেব কি উদ্ভিত হবে?

চাকুরীর সখ

এম. কে সাহা

চাকুরীর সখ মিটেছে সবার
দরকার নেই, বেশী কিছু বলার
সেখানে সুখ নেই, মমতা নেই
আছে শুধু হাহাকার।

স্বাভার আগে যাবার সময়
চারদিক থেকে হাজার খবর
তারপরেতে বসের ঠেলা
এ যেন এক মহাজালা।

তবুও সবাই চাকুরী করে
বেকার থেকে মুক্তি পেতে,
মুক্তি নয়, যেন এক বন্দীদশা
যেথা আছে শুধু হতাশা।

এর চেয়ে তাই ব্যবসা ভালো
যদিও হয় তা ছোট খাটো
আসুন সবাই ব্যবসা করি
স্বাধীন ভাবে জীবন গড়ি।

এনজিও

এম. কে সাহা

চাকুরী হলো মাঠে ঘাটে
ঘুমানো যায় না, মজার খাটে
বন্দীদশা জীবন মোদের
কষ্টে ভরা জীবন যাদের।

এদিক গিয়ে, ঐ দিক গিয়ে
হাজার রকম মানুষ মিলে
রং বেরংয়ের কথা শুনে
নিত্য মোদের জীবন চলে।

ট্রেনিং চলে অফিস চলে,
কাজের ফাঁকে গান চলে
জীবন চলে বন্দী কলে
মাঝে মধ্যে ধমক মিলে।

তবুও সবাই চাকুরী খোঁজে
নিয়োগ পেলে গর্ব করে
কাজের চাপে চাকুরী ছাড়ে
তাতেই হয়তো মান বাড়ে।

গুজ-ছার-অ

পরমেশ্বর চাক্‌মা

সময় থাকতে হাল্‌ ধর
নুঅ-আমলির গুজ-ছার-অ
চিলিক বিলিক ন-গরি
নুঅ-দি-ন-ল লাই চিদা গ-ব-অ
যারে ভাবিলা আংমুলি
তে বজ্‌-দে গিজ্‌ ছুরি

জাদর কদা দুল পিদি
গরাস ভরাই নি-চিদি
তেম্-মাংঙত বুগ-দি লামে
নুঅ-আমলি পুন-মাদান দেগা-ন-দে
সাধু হলে দো চে-ল-অ
নু-দি মিলার গর-ধরল
চেঙে কুল মেঅনী কুল
নুঅ-আমলির ফাদা দুল ।

আঁকড়ে থেকো না

(গুজ-ছার-অ, কবিতার বাংলা ভাবানুবাদ)

পরমেশ্বর চাক্‌মা

জ়েগে উঠ নবীন অনাগত মানব মাতৃজঠরে
নতুন দিনের কাগরী হতে
নতুন সর্দারের ললাটে লাল তিলক ঐঁকে দিতে
সর্দারের নিজীব পুত্রা এখনো সময় আছে
কৃপমন্ডুকতার আস্তানা ছাড়তে
এতদিন জ়েনেহ ভেবেছ যারে অগ্রনায়ক
আজ নিশ্চিত জ়েনো সেই পশ্চাদপদ

জাতপাতের জিগির তুলে
রাজহংসের পালকে ভর করে
গিচালা রাজপথে নারী মুক্তির শ্লোগানকে পদদলিত করে
নতুন সর্দার ঠাই নিয়েছে হেলেন আফ্রোদিতির মায়াবী ভুবনে
চেসী মাইনি জনপদে প্রচারিত শৃংখল ভাঙ্গার গান
নতুন সর্দারের ফাঁকা বুলি মাত্র ।

প্রান্তিক জাতির বীজের অধিকার

পাভেল পার্থ

ক্যানছাই চ্যায়ানের উপকূলীয় বালিয়াড়ি জংগলে ইয়াখে (জুম চাষ) করতেন রাখাইন জনগণ। কত জাতের চাপা(ধান), পোম্বা(পাটগাতি), সেমফু(ভূট্টা), চাখ(বেগুন) লাগানো হতো। বালিয়াড়ি জংগলে যেখানে এখন বনবিভাগ ঝাউবাগান করেছে তার কাছে সর্বশেষ ইয়াখে করেছিলেন রাখাইনরা প্রায় ২৫-৩০ বছর আগে। ক্যানছাই চ্যায়ানে তংচাপা ধানটি সর্বশেষ লাগানো হয় এখন থেকে সেই পঁচিশ তিরিশ বছর আগেই। ক্যানছাই চ্যায়ানে এই ধান সর্বশেষ লাগিয়েছিলেন নুয়ামা রাখাইন এবং উ চাদু। এই ধানটির রঙ সাদা, চাল সাদা। গাছ দুই থেকে আড়াই হাত লম্বা, ধান ও চাল চিকন। মাত্র দেড় মাসে ফলত। উঁচু এলাকার ধান এটি। ক্যানছাই চ্যায়ানে এই ধানটিই পয়লা লাগোনের নিয়ম ছিল, কাটাও হত এই ধানই পয়লা। এই ধানের ছড়া ফুলের মতন মেলে থাকে বলে একে পানছব/পানচাপাও বলতো। এই সব কোনোকিছুই এখন আর নেই, এখন আর ক্যানছাই চ্যায়ানে ইয়াখে হয় না। সেইসব রাখাইন ধান আর ফসলগুলিও এখন আর নাই। আগে এই ক্যানছাই চ্যায়ানে ৪৫-৫০ টি রাখাইন বসতি ছিল। বর্তমানে মাত্র ১০-১১ টি পাড়া কোনারকমে টিকে আছে। বহিরাগত বাঙালিরাই এখন এই ক্যানছাই চ্যায়ানের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী। ক্যানছাই চ্যায়ানের নাম বদলে রাখা হয়েছে কুয়াকাটা। এই কুয়াকাটা বর্তমানে আজ দেশের অন্যতম পর্যটন এলাকা। বহিরাগত বাঙালিরা এখন এই ক্যানছাই চ্যায়ানে হাঙরের ব্যবসা করে, হোটেলের ব্যবসা করে, বিদেশি মদের ব্যবসা করে, আর বেশ্যানারীর ব্যবসা করে। রাখাইনদের ইয়াখে থাকল কি মরল এসব নিয়ে কেউ প্রশ্ন তোলেনা। রাখাইনদের বৈচিত্র্যময় ধান ও ফসল নিয়েও কোনো প্রশ্ন তোলা এই পর্যটন হোটেল আর হাঙর ব্যবসার এলাকায় অনেকটাই বেসামাল ঘটনা।

এমও তাং (৭০), ক্যানছাই চ্যায়ান (কুয়াকাটা), পটুয়াখালী।

মধুপুর ছিল বলসাল ব্রিং(শালবন)। মান্দিরা এখানে হাবাহুছাআ(জুম চাষ) করতেন। মি.মিদ্দিম, মি. সারাং, মি.খচ্চু, দেমব্রা জাগেদং, সারেংমা-রংথাম্বেন, চাপড়াকানথং,

মি.জেংগেমসহ কত জাতের মি.মান্দি(ধান) চাষ করতাম আমরা। মি.খপ, খিল, মিশি, থাবলুচু, থা.থুরাক, ফংরাও, আলত, আখখরু, গোয়েন্দা, গেনাশি, খারেক লাগানো হত। রাষ্ট্র মধুপুরের মান্দি কোচদের জুমচাষ আইন করে তা বন্ধ করে দিল। বলসাল বিং পাহারা দিতে আসলো বন্দুক নিয়ে। জংগল কেটে বিদেশি গাছ আর রাবার বাগান বানাল। না থাকলো কোনো মাত বিং (বন্য জীবজন্তু), না থাকলো কোনো বিং নি দো (পাখি), না থাকলো কোনো সাম ফাং(ঔষধি গাছ)। হাবাহুছাআ বন্ধ করার লগে লগে হারিয়ে গেল মান্দিদের হাজার রকমের ধান ও শস্য ফসল। এখন তো কেবল মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি নাম্বারঅলা ধান চাষ হচ্ছে। বিআর-১১, বি ধান-২৮, পাইজাম এইসব। আর কেবল আনারস আর কলা। এখন আবার ইকোপার্কের নামে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে চায় বনবিভাগ। যেখানে আদিবাসীরা আপন ভূমির লাগি লড়াই করছে সেখানে আপন ধান ও শস্য ফসলের অধিকারের কথা কেউ কি শুনতে চাইবে?

সত্যেন্দ্র চিরান (৭২), বেদুরিয়া, মধুপুর, টাঙ্গাইল।

বাংলাদেশের সকল প্রান্তের কৃষি ও জুম জীবনের মানুষেরা সকলেই আজ আপন বীজ শস্য ফসলের বৈচিত্র্যময় অধিকার থেকে বঞ্চিত। কৃষি বহুজাতিকরণের এই পণ্য বিশ্বায়নের সময়ে বাঙালি কৃষির চাইতেও প্রান্তিক জাতিদের আপন জুম জীবন আজ আরো ভয়াবহভাবে প্রান্তিক। বাঙালি কৃষির দাপটে বাঙালি ভিন্ন অপরাপর জাতিসত্ত্বাদের কৃষিবৈচিত্র্য বিষয়ে কোনো বিশ্বস্ত দলিল দস্তাবেজ এই বাঙালি রাষ্ট্রের ধারে নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকায় চাঙমারা তাদের জুম করার সময় এবং ত্রিপুরারা হউক করার সময় বৈচিত্র্যময় ধানের পাশাপাশি লাগাতেন জুমকুমড়ো, জেদরেং, জেদেনাবিজি, হম্বইমক্কো, সুইদ-মরিজ, খুরুবক্কালোই, চিওনশাগ, পুচি, শদরুক, হেজবিজি, খুচাঙমা, কিস্তি-তেলাউ, খেতলা, সোরপ্য সীম, কথলিং এরকম অগণিত শস্যফসল। রাষ্ট্রীয় ভাবে পার্বত্য এলাকায় জুম নিয়ন্ত্রণ, বনবিভাগের খবরদারি, উত্তরোত্তর বাঙালি ও বহুজাতিক কৃষির প্রবেশ, পাহাড় জংগল সব সেনাবাহিনীর দখলে চলে যাওয়ায় পার্বত্য এলাকার জাতিসমূহের আপন শস্য ফসলের অধিকার ক্রমান্বয়ে বিপন্ন হয়ে পড়ে। বর্তমানে চাঙমা-ত্রিপুরারা আপন জুমের অধিকার হারিয়ে বিপ্লব, কোম্পানী ধান, বি আর-১১, বি আর-১২, বাঙালি বেগুন, হাইব্রিড মূলা, লালতীর মার্কা হাইব্রিড, হাইব্রিড আড়াইমাসী সীম, চায়না ইরি, ইরি-৮, ভারতীয় মাসুরী, পাইজাম, বি ধান-৩২, হাইব্রিড বরবটি, চীনা মূলা চাষ করেছেন। বাঙালি অঞ্চলের সমভূমির কৃষি সম্পর্কে যতটা খোঁজখবর পাওয়া যায় তার পরিমাণে বাঙালি বাদে অপরাপর জাতিসত্ত্বার নিজস্ব কৃষি সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট, কার্যকরী ও অংশগ্রহণমূলক ইতিবাচক তথ্য উপাত্ত বা বিবরণ রাষ্ট্রের কাছে নাই। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর সমাজেই নিজস্ব চাষাবাসকে বুঝানোর মত শব্দ ধারণা থাকলেও বাংলাদেশে একত্রে তা 'জুম চাষ' হিসেবেই বুঝানো হয়।

মান্দিদের হাবাহুছাআ,

মাইনমাদের ইয়া,

খাসিয়াদের বি,

পার্বত্য চট্টগ্রামের ত্রিপুরাদের হউক,

সিলেট অঞ্চলের ত্রিপুরাদের হাবা,
চাকমাদের জুম ,
বমদের লাউ,
খিয়াংদেরলৌ,
ম্বোদের হ্যোআ,
রাখাইনদের ইয়াখের

কোন ইতিহাস আমাদের জানা নাই। দুনিয়ার ৩০ কোটি বিপন্ন প্রান্তিক জাতিদের ভেতর বাংলাদেশের ২৫ লাখ প্রান্তিক জাতিগোষ্ঠীরাও আজ জাতিগত নিপীড়নের শিকার। “উন্নয়ন”, “গবেষণা”, “নিরাপত্তা”, “বনায়ন”, “পর্যটনের” নামে এই রাষ্ট্রে প্রান্তিক জাতিদের জুম জমিন ও বসত নিরন্তর দখল হয়ে যায়। আর এই জঙ্গী দখলী প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই প্রান্তিক জাতিদের অগণিত শস্যফসলের বৈচিত্র্য হয়েছে নিশ্চিহ্ন। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বহুজাতিক কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক কৃষি ব্যবস্থার প্রসার ও বনবিভাগের জুমনিয়ন্ত্রণের ফলে দুনিয়া থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে রকমভিন্ন শস্যফসলের জীন।

ষাটের দশকে যখন আমাদের দেশে তথাকথিত সবুজ বিপ্লবের নামে স্থানীয় শস্যফসল নিশ্চিহ্নকরণের জ্বরদস্তি তৈরি হয় এবং বহুজাতিক কোম্পানীর সার-বিষ-কৃষিযন্ত্র ও বীজ ব্যবসার পণ্যবৈধতা জোড়দার হয় প্রান্তিক জাতিসমূহের এলাকাগুলোও তার বাইরে থাকেনা। এমনকি পার্বত্য এলাকায় ষাটের দশকে যখন কর্ণফুলী গাঙে কাণ্ডাই বাঁধ দেয়া হয় এর ফলে যেমন প্রান্তিক জাতিদের জুম-জমিন-বসতই তলিয়ে যায় তা নয় একই লগে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় অগণিত শস্য ফসলের বৈচিত্র্য আর আপন চাষকেন্দ্রিক জাতিগত লড়াই জ্ঞান ও সংস্কৃতি। রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়মনীতি করে প্রান্তিক জাতিদের জুমকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে অপরাপর এলাকাতে সম্পূর্ণতঃ নিষিদ্ধ করা হয়। বনবিভাগের জ্বরদস্তি ও নিরাপত্তার নামে সেনাবাহিনীরা পাহাড়ের পর পাহাড় দখলের ভেতর দিয়ে নিশ্চিহ্ন হয় প্রান্তিক জাতিদের জুমফসলের অগণিত বৈচিত্র্যময় সমাহার। পার্বত্য চট্টগ্রামে ১৯৯০ সালের শাসনবিধি মোতাবেক জুমচাষ পরিচালিত হয়ে এসেছে। রাষ্ট্রীয় ভাবে অধিকৃত সংরক্ষিত(!) বনাঞ্চলের বাইরে পাহাড়ী খাস জমিতে জুম চাষের অধিকার স্বীকৃত। পার্বত্য চট্টগ্রাম বাদে বাংলাদেশের অপরাপর প্রান্তিক জাতিসমূহের এলাকাগুলোতে জুম চাষ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশে বাঙালি বা সমতল কৃষির কৃষকদের বীজের অধিকারই নিশ্চিত নয় এবং বীজ নিরাপত্তা বলতে বহুজাতিক কোম্পানীর ব্যবসাকেই বোঝানো হয় তারপরও আইন করে সমতল কৃষিকে কি নিয়ন্ত্রণ করা হয়? বাঙালির কৃষিকে কি প্রান্তিক জাতির জুম চাষের মতন রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করা হয়? বাংলাদেশে বীজ নিরাপত্তা বা বীজের অধিকার বা কৃষি বলতে কেবলমাত্রই বাঙালি কৃষির ধারণা ও বাঙালি কৃষককে গণ্য করা হয়। যেন রাষ্ট্রে আর কোনো চাষবাস নাই। যেনো রাষ্ট্রে আর কোনো বীজবৈচিত্র্য নাই। সমতল কৃষির শস্যফসলের আপন বীজ সম্পর্কিত বিশ্বস্ত তথ্য-উপাত্ত যেমন আমাদের ধারে অজানা, প্রান্তিক জাতিদের ক্ষেত্রে তা আরো ভয়াবহভাবে নিখোঁজ।

রাষ্ট্রে বাঙালি বাদে অপরাপর জাতিসত্তার কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি নাই। রাষ্ট্রের সকল নীতি, আইন-কানুন, চুক্তি, অধ্যাদেশ সবই আদিবাসীদের কোনো মূল্যায়ন করেনি, সমস্বীকৃতি সমঅধিকার নিশ্চিত করেনি। জাতীয় বীজনীতিও তার বাইরে নয়। বাংলাদেশে ১৯৯৩ সনে, ‘ফসলের উৎপাদন, কৃষকদের উৎপাদনশীলতা মাথাপিছু আয় এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সর্বোচ্চ মানের উন্নতজাতের ফসলের বীজ কৃষকদের নিকট সহজে ও দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেয়ার’ উদ্দেশ্যে জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩ প্রণীত হয়। কিন্তু জাতীয় বীজনীতির উদ্দেশ্য কেবলই বাঙালি কৃষক ও বাঙালি অঞ্চলের কৃষি ফসল ও বীজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আদিবাসী অঞ্চলের জুম কৃষি ফসল বীজের লক্ষ্যে জাতীয় বীজনীতি প্রণীত হয়নি।

জাতীয় বীজনীতির নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলীর ভেতর আছে, উন্নতমানের বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ, গুদাম জাতকরণ এবং উন্নত বীজ ব্যবহারের উপর কৃষিবিশেষজ্ঞ ও কর্মী এবং বেসরকারী বীজ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ ও কারিগরী সহায়তাদানের মাধ্যমে বীজ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ{(১.২(৬), জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩)}।

যে ব্যবস্থা আদিবাসীদের জুম ফসল সম্পর্কে কোনো জ্ঞান রাখে না তার পক্ষে কিভাবে জুম উপযোগী “উন্নতমানের বীজ উৎপাদন” সম্ভব? জুম বীজ কিভাবে সংরক্ষণ করা হয় তাও এই রাষ্ট্র জানে না। জুম বীজ সংরক্ষণের জন্য রংদিক, মাভিতুবা, তালি, ডিরতম, লাউ, ফং, ঝুড়ি এইসব কি রাষ্ট্রের কাছে আছে? জুম বীজ কি আর বাঙালি কায়দা ও ধারণা দিয়ে সংরক্ষণ করা যাবে। জাতীয় বীজনীতির বীজ বিধিমালাতে নিয়ন্ত্রিত ফসল বলতে শুধুমাত্র ধান, গম, পাট, আলু, এবং আখ কে নির্ধারিত করা হয়েছে। আদিবাসীদের রকমভিন্ন শস্যফসলের বীজবৈচিত্র্যের কোনো হদিশ বীজনীতির ভেতর দিয়ে সংরক্ষিত হয় না। বীজনীতিতে প্রাতিষ্ঠানিক খাতগুলো শক্তিশালীকরণের কথা বলা হয়েছে, আর প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠনের কথা বলা হয়েছে। জাতীয় বীজনীতিতে জাতীয় বীজ বোর্ডকে পুনর্গঠনের জন্য বলা হয়েছে এখানে ১৩ কৃষক সমিতির প্রতিনিধিও থাকবেন(জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩, অনুচ্ছেদ ১১.১.২)। কিন্তু একজন কৃষক প্রতিনিধি কি করে পুরো দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন? একজন মাইনমা কি করে মান্দিদের বীজ সম্পর্কে জানেন? একজন বাঙালি কি ‘ম্রো’দের জুমফসলের বীজ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন? রাষ্ট্রের ৪৫ বা তারও বেশী জাতিসত্তার ভেতর নিজস্ব কৃষক প্রতিনিধি কি করে একজন নির্বাচিত হবেন? এই রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা কি এভাবেই প্রাণবৈচিত্র্যকে বিনাশ করবে চিরকাল?

জাতীয় বীজনীতির অনুচ্ছেদ ১১.২.৬- এসংরক্ষিত বীজ মজুদ বিষয়ে উল্লেখ আছে যে, ‘কাজটি বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে বীজ উইংকে আর্থিক বরাদ্দসহ বীজের নিরাপত্তা মজুদের ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হবে’। বাংলাদেশে যেখানে বাঙালি অঞ্চলের স্থানীয় শস্যবীজ বিষয়েই কোনো বাজেট বরাদ্দ থাকে না সেখানে জুম কৃষির বীজ বিষয়ে বাজেট অর্থ বরাদ্দ বা রাষ্ট্রের সহযোগীতা দাবী করা বাঙালি এই কৃষক রাষ্ট্রের কাছে কোনোই অর্থ তৈয়ার করে না। বীজনীতির কৃষি গবেষণা প্রক্রিয়া(এন এ আর এস) ও রাষ্ট্রের কৃষি সম্প্রসারণ

বিভাগ, কৃষি তথ্য সেবা, কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কখনোই আদিবাসী জুমিয়াদের আপন বীজের নিরাপত্তা ও অধিকার বিষয়ে কখনোই ভাবেনি।

কেবলমাত্র জাতীয় বীজনীতি (১৯৯৩) নয়, বীজ অধ্যাদেশ (১৯৭৭), বীজ (সংশোধন) আইন ১৯৯৭, বীজ বিধিমালা ১৯৯৮সহ কোনো রাষ্ট্রীয় আইন বা নীতিতেই আদিবাসীদের আপন বীজবৈচিত্র্য বিষয়ে কোনো তথ্য উপাত্ত বা প্রসঙ্গ নাই। যদিও বাঙালি কৃষকেরই আপন শস্য বীজের অধিকার এই বীজনীতির মাধ্যমে নিশ্চিত করা কখনোই সম্ভব নয় তারপরও আদিবাসীরা এই তথাকথিত কেবলি বাঙালি পুরুষ কৃষকের জন্য নির্ধারিত বীজনীতির দ্বারাও বিপন্ন হচ্ছেন নিরন্তর।

.....বাঙালি রাষ্ট্রই বিনাশ করেছে আদিবাসী এলাকার বীজ ও
জীনবৈচিত্র্য

বাঙালি রাষ্ট্রের জঙ্গি শাসনে নিশ্চিহ্ন আজ আদিবাসী এলাকার বীজবৈচিত্র্য। এক একটি জাত হারিয়ে যাওয়া মানে অগণিত জীন ও জীনবৈচিত্র্য দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হওয়া। যে জীন প্রাণের সকলবৈশিষ্ট্য ও পরিচয় মেলে ধরে। হয়তো যে সব জীন আমাদের আপন স্থায়ীত্বশীলতাকে আরোও প্রতিরোধী করতো, সেসব জীন আর আমাদের মাঝে নেই। কারণ সেসব জীন যেসব শস্যফসলের ভেতরে ছিল সেসব শস্যফসলের কোনো হৃদিশ আজ আর নেই। শস্যফসলের বৈচিত্র্য কমে যাওয়া মানে দুনিয়ায় জীনবৈচিত্র্য কমে যাওয়া। আর জীনবৈচিত্র্য কমে যাওয়া মানে হল, গোটাকয় জীন-সম্পদ দুনিয়ায় টিকে থাকা যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবর্তন করতে পারবে মারদাঙ্গা বহুজাতিক কোম্পানীগুলোই খুবই অনায়াসে। নিয়ন্ত্রিত জীনসম্পদের ভেতর দিয়েই কোম্পানীর তৈরী করা বীজের ভেতর দিয়ে তখন আমাদের কৃষি ও জুম বদলে বদলে “ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফুড প্রডাকশনের” বাণিজ্যিক কারখানা হয়ে যাবে। এই বাঙালি রাষ্ট্রে সর্বাধিক আদিবাসী ফসলের জীনবৈচিত্র্য বিনাশ করেছে মহামান্য বনবিভাগ।

টান্গাইলের মধুপুর, শেরপুর, জামালপুর, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহের আদিবাসী এলাকাসমূহে জুমচাষ বন্ধ করার ফলে নিশ্চিহ্ন হয়েছে অগণিত জীনসম্পদ। মধুপুর বিপন্ন শালবনের মান্দিরা রাও, ফং, খিল, মিখপ, ফেন সহ অগণিত জুমফসলের তালিকা এখনও বয়ান করেন যা বনবিভাগ কর্তৃক জুমচাষ বন্ধ করার ফলে হারিয়ে গেছে। ১৮৮২-৮৩ সাল নগাদ পুরো পার্বত্য চট্টগ্রামের ২৪ ভাগ এলাকে ‘সংরক্ষিত বনএলাকা’ ঘোষণা করে সেখানে আদিবাসীদের প্রবেশাধিকার নিষেধ করে বনবিভাগ। ‘বনায়নের নামে’, ‘সংরক্ষণের নামে’ অগণিত প্রাণবৈচিত্র্য ও বীজসম্পদ নিরন্তর নিশ্চিহ্ন-লুট-দখল করার বনবিভাগীয়, রাষ্ট্রীয়, বহুজাতিক জঙ্গিগিরি আদিবাসী এলাকাসমূহে এখনও বহাল। ধান বাদে বাকমন্ডিন শস্য থাকলেও আমরা বাংলাদেশের প্রান্তিকজাতিদের কেবলমাত্র ধানসমূহের ছোট্ট একটা তালিকার নমুনা এই বয়ানে হাজির করছি। প্রান্তিক জাতিদের এইসব ধানবৈচিত্র্য বিষয়ে রাষ্ট্রীয় কোনো হা-হুতাশ নাই। নাই কোনো দস্তাবেজ। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট(বি) থেকে ১৯৮২ সনে ‘দেশী ধানের জাত’ নামে যে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়েছে তাতে কোথাও আদিবাসীদের ধানগুলো বিষয়ে সুস্পষ্ট তথ্য উপাত্ত রাখা হয়নি। এমনকি যখনই কৃষিতে রাষ্ট্রীয় ভর্তুকির প্রশ্ন বা বাহাস ওঠে তখন প্রবলভাবে আদিবাসীদের জুমকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

(জুম ফসলের বৈচিত্র্য, জুম চাষের অধিকার বিষয়ে নানান আলাপের পর এবং চলতি লেখাটি খাগড়াছড়ি জেলার দীঘিনালা উপজেলার ভৈরফা নোয়াপাড়া গ্রামের প্রবীণ অভিজ্ঞ জুমিয়া, বাবু পূর্ণমনি চাকমাকে দেয়ার পর তিনি তাঁর মতামতটুকু লিখিতভাবে দেন। তাঁর আগ্রহ এবং অনুমতি সাপেক্ষে চলতি লেখাটিতে এই অভিজ্ঞ বয়ানখানি সংযুক্ত করা হল।) পূর্বে জুমচাষের উপর নির্ভর করেই পাহাড়ি আদিবাসীগণ মহাআনন্দে যুগ যুগ ধরে কোন অভাব-অনটন ছাড়াই স্ব-স্ব সংস্কৃতি রক্ষা করে আসছিল। আমি দেখেছিলাম আদিবাসী জুমচাষীরা তাদের জুমের উপর হাট-বাজারে পরিণত করে সবরকম চাহিদা মেটাতে। বিভিন্ন রকমের ধানের বীজ বপন করে বৎসরের খাদ্য, তরিতরকারি, মসলা জাতীয় বিভিন্ন ধরনের শাক, মরিচ, তিল, দারু গাছ, জুমকুমড়া, আলু, কচু, তুলা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন করে নিজস্ব জীবনধারা বজায় রাখত। নিজস্ব কারিগরী শিক্ষায় তুলা হতে সূতা তৈরীর জন্য সর্গা, সর্গী দিয়ে সূতা মিলে কারখানায় পরিণত করত। কিন্তু বর্তমানে ফরেস্ট বিভাগের জুম চাষ নিয়ন্ত্রণ করায় আদিবাসী জুম চাষীরা জুমচাষ থেকে দিন দিন বঞ্চিত হচ্ছে এবং সাথে সাথে তাদের বিভিন্ন জুম বীজ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। জুমচাষীদের ঐতিহ্য যেমন লুপ্ত হচ্ছে তেমনি জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন পাখির দল, বিভিন্ন বন্য জীবজন্তুরা হারাচ্ছে তাদের আশ্রয়। যদি এই অবস্থায় জুমচাষীদেরকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করা হয় তাহলে জীববৈচিত্র্য সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হবে। বিলুপ্ত হবে বনাজী ঔষধি গাছপালা, লতাপাতা। এইসব ঐতিহ্যকে রক্ষীয়ভাবে রক্ষা করা প্রয়োজন। এককালে আদিবাসী জুম চাষীরা বনাজী ঔষধের দ্বারা তাদের জীবন অত্যন্ত কম অর্থে ব্যয়ে রক্ষা করেছিল। চাকমা ভাষায় আমরা দারুগাছ বলি, মানে বনাজী ঔষধের গাছ। কাজেই আদিবাসী জুমচাষীদের নিজস্ব জুম চাষ করার অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। আরো উল্লেখ করা যাচ্ছে যে, জুম চাষীরা তাদের জুমের রাজস্ব খাজনা দিয়ে নিজ নিজ জুমের মাটিতে তাদের একধরনের অধিকার নিশ্চিত করত। আজ আদিবাসীদের জুম চাষের জন্য বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তেমনি বঞ্চিত করা হচ্ছে সমতল কৃষকদেরকেও। যেমন সমতল ভূমি হতে বিভিন্ন এলাকার লোকজনকে আদিবাসী এলাকায় জুমচাষের জায়গাতে ছড়িয়ে দিয়ে সমতল এলাকার কৃষকদের চাষবাসের অধিকারকেও নিশ্চিত করা হচ্ছে। লুপ্ত হচ্ছে তাদেরও বিভিন্ন ধানের বীজ, লুপ্ত হচ্ছে তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এ ব্যাপারেও রক্ষীয়ভাবে সহযোগীতা দিয়ে এগিয়ে আসা প্রয়োজন। যেমন ১৯৬০ সালে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণের ফলে হাজার হাজার আদিবাসী কৃষক পরিবারের নিজস্ব চাষ বাসের জমি কাপ্তাই হ্রদে ডুবে যায়। আমি দেখেছি কাচালং, মাইনী, চেসী, ফেনীনদীর এলাকা থেকে হাজার হাজার জুম উদ্বাস্তু মানুষ কোথাও জায়গা না পেয়ে নিজের জায়গা নিজের দেশ ছেড়ে এমনকি ভারতের ত্রিপুরা অরুনাচল প্রদেশে যেতে বাধ্য হয়েছিল। বর্তমানে তাদের অবস্থা খুবই দুর্বিষহ। এইসব আদিবাসীরা যেসব স্থান ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হয়েছিল সেখানে আবার সমতলবাসী বহিরাগত বাঙালী বসতি স্থাপন করা হয়েছিল, এখনও পর্যন্ত করা হচ্ছে, সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন রকমের জীব-

বৈচিত্র্য সমস্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য মানবাধিকার সহকারে সরকারকে এগিয়ে আসা উচিত। আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে, ভূমিহীন জুমিয়া পরিবারদেরকে নিয়ে উঁচুভূমি বন্দোবস্তীকরণ প্রকল্প নামে বিভিন্ন আদিবাসী এলাকায় রাবার চাষ করা হচ্ছে। এসব রাবার বাগানের মাটি পুনর্বাসন পরিবারদের নামে বন্দোবস্তী করে দেওয়ার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সংবিধান হিসাবে চুক্তি নামাপত্র রচনা করা হয়েছিল। বর্তমানে দেখা গেল, দীর্ঘ ২২ বৎসর যাবৎ বহু পরিবারের এখনও পর্যন্ত কোনো বন্দোবস্তী হয় নি। এমনকি বন্দোবস্তী পাবে কিনা তাও পুনর্বাসনকারীদের সন্দেহ রয়ে গেছে। যার কারণে এসব পরিবারগুলো যে জুম চাষ করত সেই জুম চাষ হারিয়ে অতীব অনিশ্চিত জীবন-যাপন করছে। কাজেই তাদের নিজস্ব জুমচাষের অধিকারসহ একটি নিরাপদ জীবনধারণের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। যে জুমে তারা আনন্দ উল্লাসে, হাট-বাজার সামনে রেখে দিন অতিবাহিত করত সেই জায়গায় তারা ভূমিহীন হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। কাজেই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদেরকে নিজস্ব জুম চাষ করার অগ্রাধিকার নিশ্চিত করে, আদিবাসীদের নিয়ে জুম নিয়ন্ত্রণ নয়, জুম উন্নয়ন বোর্ড গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। তা নাহলে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জুম চাষীরা বঞ্চিত হলে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী জুম ফসল ও সাংস্কৃতিকধারা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বিলুপ্ত হয়ে যাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের জীব-বৈচিত্র্য।

..... আন্তর্জাতিক ধান বর্ষ ও আদিবাসী দশক

মহামান্য জাতিসংঘ সারা দুনিয়ায় আদিবাসীদের অধিকারের প্রশ্নে ১৯৯৩ সনকে আদিবাসী বর্ষ, ১৯৯৫-২০০৪ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদিবাসী দশক ও প্রতিবছরের ৯ আগস্টকে 'আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস' ঘোষণা করেছে। এছাড়াও ২০০৪ সনকে "আন্তর্জাতিক ধানবর্ষ" ঘোষণা করা হয়েছিল। আন্তর্জাতিক ধানবর্ষ বা আদিবাসী দশক উভয়েই নানান জায়গা থেকে বিতর্কিত এবং প্রশংসাপেক্ষ হলেও এই রাষ্ট্রে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রীয়ভাবে যেমন 'আদিবাসী' দিবস পালিত হয়নি ঠিক তেমনি আদিবাসীদের আপন ধানের অধিকার বিষয়ে রাষ্ট্রে তেমন কোনো মাতামাতি হয়নি। অথচ প্রতিটি আদিবাসী এলাকাতেই বীজসম্পদ শস্য জ্ঞানের বহুজাতিক ছিনতাই চলছে। এসব ছিনতাইকেই বৈধ করেছে "জাতীয় বীজনীতি (১৯৯৩)" সহ রাষ্ট্রের অপরাপর বাঙালি আইন নীতি সমূহ।

জাতীয় বীজনীতি(১৯৯৩) এর বীজ আমদানীর ক্ষেত্রে উল্লেখ আছে, 'উদ্ভিদ সঙ্গনিরোধ পদ্ধতি ফসল/উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এবং জাতের ক্ষেত্রে নয় (অনুচ্ছেদ ৮.২, জাতীয় বীজনীতি ১৯৯৩)। কিন্তু মধুপুরের বিপন্ন বলশালব্রিং(শালবন) এলাকায় নীল, কলা, আনারস ও পার্বত্য চট্টগ্রামের জুমিয়াদের কাছে চলতি সময়ের "কোম্পানী ধান" নামে নানান একক ফসল(মনোকালচার/মনোক্রপিং) ও জাতের ভিতর দিয়ে কী হারে আদিবাসী বীজ সম্পদ দখল চলছে তা খতিয়ে দেখার জন্যে কি রাষ্ট্রে কোনো আদিবাসী বীজবান্ধব আইননীতি থাকবে না?

জাতীয় বীজনীতিতে বীজ নিরাপত্তা প্রসঙ্গে অনুচ্ছেদ-১০ এ-উল্লেখ আছে, বি এ ডি সি এবং জাতীয় কৃষি গবেষণা সিস্টেম স্বল্প পরিমাণ ধান, গম ও পাট বীজ সংরক্ষণ করবে

CamScanner

Scanned

যাতে করে প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনো এলাকার বীজ নষ্ট হয়ে গেলে উক্ত এলাকায় উন্নতমানের বীজসম্পদ বিতরণ করা হবে। যখন রাষ্ট্রের আদিবাসী জনগণ নিজেদের বীজশস্য নিজেদের অধিকারে রাখতে পারছেননা, যখন রাষ্ট্রীয়ভাবে আদিবাসীদের প্রতিবেশ ও প্রাণবৈচিত্র্যবান্ধব আপন চাষাবাসকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। তখন আবার কিসের বীজ নিরাপত্তা? কিসের বীজের অধিকার? নিশ্চিহ্ন হওয়া আদিবাসীদের বৈচিত্র্যময় বীজ সম্পদ কি এ দুনিয়ায় কারো পক্ষে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব? আর আদিবাসী এলাকা গুলোতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে বীজ নিরাপত্তার জন্য কি আদিবাসীদের বীজ ফসল রাষ্ট্রের কাছে আছে?

যখন ১৯৫৭-১৯৬১ পর্যন্ত রাষ্ট্রাধিকারিত কণ্ঠফুলির গাঙ্গে কাণ্ডাই বাঁধ দিয়ে লাখ লাখ আদিবাসী এলাকা ডুবিয়ে দেয়া হয়, জুম-জঙ্গল নিশ্চিহ্ন করা হয়। ডুবে যাওয়া সেই সব আদিবাসী জনগণদের বীজবৈচিত্র্য ও অগণিত জীন সম্পদ কি এই রাষ্ট্রের পক্ষে আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব? রাষ্ট্রে এমন কোনো সহায়ক উদ্যোগ-নীতি বহাল নাই যার ভেতর দিয়ে আদিবাসী জনগণের আপনবীজের অধিকার নিশ্চিত হয়।

এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে আদিবাসী ব্যক্তিদের গড়ে তোলা নানান পরিচিত সংগঠনগুলো যেমন : জনসংহতি সমিতি, ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট, পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন, আদিবাসী ফোরাম, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন, গারো স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, বাংলাদেশ গারো ছাত্র সমিতি, খাসিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বা রাষ্ট্রের অপরাপর রাজনৈতিক দল ও নানান সামাজিক সংগঠনেরাও কখনোই জোড়ালোভাবে আদিবাসী জনগণের আপন বীজ নিরাপত্তা বিষয়ে কখনোই প্রশ্ন তুলেননি।

যেসব আপন বীজবৈচিত্র্যের লগে আদিবাসী জীবন সর্বাঙ্গিনভাবে জড়িত, আদিবাসী অধিকার আদায়ের আন্দোলনের সকল প্রসঙ্গেই আদিবাসী জনগণের এই বীজ অধিকার বিষয়টি পুরোপুরি অনুপস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গড়ে ওঠা প্রান্তিক জাতিদের আন্দোলনের কেন্দ্রীয় ভিত্তিই বলা হয়ে থাকে জুম জাতীয়তাবাদ। যে জুম জাতীয়তাবাদের ভেতর দিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে গড়ে ওঠেছে লড়াই, সেই জুমের মূল প্রাণ হল নানান জুমশস্যফসলের বৈচিত্র্যময় বীজ। জুম বীজের অধিকার ও নিরাপত্তা বিষয়ে জুমজাতীয়তাবাদী এইসব লড়াইয়ের কণ্ঠস্বরগুলো তেমন জোড়ালো করেনি তাদের পাটাতন। যে বীজের ভিতর দিয়ে মানুষের সভ্যতার ভিত্তি নির্মিত হয়েছে, রাষ্ট্র একপেশে বীজনীতির ভিতর দিয়ে আদিবাসীদের জীবন যাপনের সেই ভিত্তিকে নিরন্তর বিপন্ন করে তুলেছে। আদিবাসীদের জাতিগত অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আপন শস্য ফসলের বীজে আদিবাসীদের আপন অধিকার ও আপন বীজ নিরাপত্তার লাগি রাষ্ট্রের সকল জনগণের কল্যাণেই জাতীয় বীজনীতি (১৯৯৩), জাতীয় কৃষিনীতি (১৯৯৯) এর কার্যকরী পরিমার্জন ও সংশোধন জরুরী। যে বীজনীতি ও কৃষিনীতি রাষ্ট্রের আদিবাসী জনগণের বিষয়ে নিশ্চুপ তার ভেতর দিয়ে কখনোই রাষ্ট্রের সার্বিক বীজ নিরাপত্তা ও বীজ অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

- রাষ্ট্রের সকল জনগণের আপন চাষাবাদের সমান স্বীকৃতি ও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে।
- আদিবাসী জনগণের আপন চাষাবাসকে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করার সকল রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ বাতিল করতে হবে।
- কেবল মাত্র বাঙালি কৃষির ক্ষেত্রেই নয়, আদিবাসী জনগণের জুম বা নিজস্ব চাষাবাসেও আদিবাসী জনগণের মতামত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিতে হবে।
- আদিবাসী জনগণের সকল বীজবৈচিত্র্য ও শস্য ফসল সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত ও গবেষণা আদিবাসী জনগণের সার্বিক মতামত ও অংশগ্রহণের ভিতর দিয়ে পরিচালিত করে আদিবাসীদের বীজের কার্যকরী অংশগ্রহণমূলক সামাজিক দলিল তৈরি করতে হবে।
- আদিবাসী এলাকায় আদিবাসী নিজস্ব সামাজিক বীজাগার গড়ে তুলতে রাষ্ট্রীয় সহযোগীতা দিতে হবে।
- রাষ্ট্রীয় সহযোগীতায় আদিবাসী এলাকায় বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় শস্যফসলের বীজের সামাজিক বীজব্যাংক তৈরি করতে হবে এবং চাষবাসের ভেতর দিয়ে সকল বীজবৈচিত্র্য আরো প্রতিবেশবান্ধব কায়দায় ছড়িয়ে দিতে রাষ্ট্রীয় সহযোগীতা করতে হবে।
- শস্য ফসলের জাত নির্বাচনে আদিবাসীদের নিজস্ব মতামত, স্থানীয় প্রতিবেশ এলাকা, জাতিগত সংস্কৃতি এবং স্থানীয় জাতকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- আদিবাসী জনগণের ভেতর আপন চাষাবাসের ভেতর দিয়ে আদিবাসী এলাকার সকল শস্য ফসল সংরক্ষণে রাষ্ট্রীয় সহযোগীতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত করতে হবে।
- আদিবাসী জনগণের নিজস্ব চাষাবাস ও বীজবৈচিত্র্যকে নিশ্চিত করতে পৃথক 'জুম কর্মসূচী', পৃথক জুম সম্পর্কিত শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চা জ), কেবলমাত্র বাঙালি ও বহুজাতিক কোম্পানী নিয়ন্ত্রিত বাজারের চাহিদা আছে এমনসব শস্য ফসলের বীজ সহ সকল সংহারী বীজের ব্যবসা-বিক্রি-উৎপাদন-প্রসার আদিবাসী এলাকায় নিষিদ্ধ করতে হবে। আদিবাসীদের ঐতিহ্য
- আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত ভূমির অধিকার ও সাংবিধানিক স্বীকৃতি নিশ্চিত করতে হবে।
- আদিবাসী জনগণের কোনো বীজ-শস্যফসল যাতে কোন ভাবেই পেটেন্ট হতে না পারে এই সাপেক্ষে সামাজিক জনমত ও কার্যকরী আদিবাসী ও বৈচিত্র্যবান্ধব রাষ্ট্রীয় আইন তৈরি করতে হবে।

- বিশ্ববাণিজ্যসংস্থার নানান চুক্তি, কৃষিচুক্তি, ট্রিপস, সুই-জেনেরিস সিস্টেম, ইউপড, বায়োপাইরেসী, বায়োপ্রসপেক্টিং এইরকম নানান আন্তর্জাতিক নীতি-আইন-চুক্তি ও নানান আন্তর্জাতিক-জাতীয়-স্থানীয় বাহ্যাসের বিষয়গুলো নিয়ে আদিবাসী জনগণের সকলের ভাষায় আলাদা আলাদা ভাবে সকল তথ্য উপাত্ত দলিল রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রকাশ করতে হবে।
- বনবিভাগের সকল অপরিবেশবান্ধব ও প্রাণবৈচিত্র্যবিনাশী খবরদারী বন্ধ করতে হবে।
- আদিবাসী এলাকায় খনিজ সম্পদ উত্তোলনের নামে, সেনাদপ্তর করার নামে, কলকারখানা স্থাপনের নামে, উন্নয়নের নামে, কোনো রাষ্ট্রীয় স্থাপনা তৈরীর নামে, বনায়নের নামে, রাবার-চা-পাম-তামাক জাতীয় একক বাণিজ্যিক ফসল চাষের নামে কোনো জাতিগত ভূমি অধিগ্রহণ ও দখল করা থামাতে হবে। এইসব কোনো প্রকারেই আদিবাসী বীজবৈচিত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না।
- জাতীয় বীজনীতি(১৯৯৩), জাতীয় কৃষিনীতি(১৯৯৯) সহ সকল রাষ্ট্রীয় নীতি ও আইনসমূহ আদিবাসী জনগণের সার্বিক অংশগ্রহণ ও মতামতের ভিত্তিতে পুনর্বিব্যাখ্যা, সংশোধন করে কার্যকরী করতে হবে।

আর আপন বীজে আদিবাসী জনগণের অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রের সকল জনগনকেই আপন বীজ অধিকারের সম্মিলিত আন্দোলনে অংশ নিয়ে বহুজাতিকায়নের একচেটিয়া একক বীজ বাণিজ্যকে রুখে দিতে সামগ্রিক চেতন্য ও প্রচারের জায়গা থেকে প্রস্তুত হতে হবে আজকেই, এখন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ-সঙ্ঘ

কুমার কো কো রায়, এম-এ

“বেলা দ্বিপ্রহর।

ক্ষুদ্র শীর্ণ নদীখানি শৈবাল জর্জর
স্থির স্রোতোহীন। অর্ধমগ্ন তরী’ পরে
মাছরাঙা বসি, তীরে দুটি গোরু চরে
শস্যহীন মাঠে। শান্তনেত্রে মুখ তুলে
মহিষ রয়েছে জলে ডুবে। নদীকূলে
জনহীন নৌকা বাঁধা।”

এমনি এক নিস্তরু দুপুরে এক নদীর তীরে পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী গণ-সঙ্ঘের জন্ম।
পাহাড়ী সঙ্ঘের গঠন কার্য যখন শেষ হয় তখন পশ্চিম আকাশে সন্ধ্যাতারা জ্বলে
উঠেছে-নীল আকাশে ওক্লা নবমীর বাঁকা হাসি। ৩১ জানুয়ারী ১৯৪৭ইং পার্বত্য চট্টগ্রামের
জাতীয় জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনে প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী
গণ-সঙ্ঘ বা হিলম্যান এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ী জাতির
জন্মভূমি-লীলাক্ষেত্র-সুতরাং এমন একটি নামেরই বিশেষ প্রয়োজন ছিল যার ভেতর
দিয়েই ফুটে উঠবে এই প্রতিষ্ঠান কাদের রক্তে গড়া;-আমাদের জগতের সম্মুখে পাহাড়ী
বলেই পরিচয় দিতে হবে এবং এই পরিচয়ের ভেতরে থাকবে গর্ব, দেখাতে হবে পাহাড়ী
জাতি জগতের বুকে তাদের পাহাড়ীস্থান পাহাড়ী বুকের রক্তেই গঠন করে নেবে-তার মূল্য
যতই হউক না কেন।

ইউরোপে হিটলারের নাৎসী বাহিনীর জন্ম যেমন কতিপয় দেশভক্ত সভ্য নিয়ে এই পাহাড়ী
গণ-সঙ্ঘের সৃষ্টিও তেমনি কতিপয় পাহাড়ীবাহিনী নিয়ে। কিন্তু আজ এই পাহাড়ী গণ-সঙ্ঘ
সমস্ত ভারতে সুপরিচিত-এই সঙ্ঘ নিজের সত্যের বলে-ভারতের বুকে স্থান করে
নিয়েছে। সমস্ত পাহাড়ী জাতি এর জন্য আজ গর্ব অনুভব করে। গঠনকার্যের সঙ্গে সঙ্গেই

এই পাহাড়ী সঙ্ঘ ভারতের নেতাদের কাছে দৃঢ় স্বরে প্রকাশ করেছে পাহাড়ীজাতির স্বপ্ন কি-জাতির দাবী কি এবং পাহাড়ী সঙ্ঘের দাবী সত্যের উপর স্থাপিত, ন্যায়ের উপর স্থাপিত-সমস্ত ভারতের নেতাদের যা চমৎকৃত করেছে। জগতের দায়ীত্বশীল শাসনই এই পাহাড়ী সঙ্ঘের সর্বপ্রথম স্বপ্ন। আমাদের মাতৃভূমির সমস্ত শাসনভার জাতীয় রাজাসহ একযোগে সম্পূর্ণ মিলনের সূত্রে আমাদের পার্বত্য চট্টলাকে আমরা রক্ষা করব। এই দাবীর সঙ্গে সঙ্গেই এই পাহাড়ীবাহিনীকে প্রথম সম্মুখে এসে দাঁড়াতে হয়েছে ভারত হতে বিতারিত ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে-এই যুদ্ধে পাহাড়ীবাহিনী নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় স্পষ্টভাবেই দিয়েছে-তারা সম্পূর্ণ জয়ী হয়েছে কারণ এই পাহাড়ীবাহিনীর পশ্চাতে রয়েছে হাজার হাজার পার্বত্য নরনারী-ভগবানের আশীষ আমাদের অস্ত্র-এই বাহিনীকে পরিচালনা করেছে।

এ গভীর বাণী-“জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
ওরে উথলি উঠেছে বারি,
ওরে প্রাণের বেদনা প্রাণের আবেগ রুধিয়া
রাখিতে নারি।

থর থর কর কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খসে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে।”

ন্যায়ের উপর সত্যের উপর যেই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা তাকে জগতের কোন শক্তিই আজ বাধা দিতে পারবে না। সমস্ত পাহাড়ী জাতিই আজ পাহাড়ীবাহিনীর মঙ্গল কামনা করে কেননা এই সঙ্ঘ দাবী করে পাহাড়ী জাতির প্রকৃত মঙ্গল-এই পাহাড়ী সঙ্ঘের বাণী আদর্শের বাণী মুক্তির বাণী-ভগবানের স্বাগত বাণী। এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা সত্য-শিব এবং সুন্দরের আদর্শে। পাহাড়ী গণ-সঙ্ঘ দেশের সর্বশ্রেণীর মিলনের ভেতর দিয়েই দেশের স্বাধীনতা এবং মঙ্গল কামনা করে।

আজ ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়েছে সমস্ত ভারতে। পার্বত্যবাসী বিশেষ সুখী এই পার্বত্য অঞ্চলেও বিমুক্তময় ব্রিটিশ শাসনের নব্বই বৎসরের কলঙ্কময় রাজত্বের সম্পূর্ণ অবসান দেখে। ইংরেজ রাজত্ব এই পাহাড়ী জাতিকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল-আমাদের মানুষের মত বাঁচবার অধিকার দেয়নি-তিলে তিলে পাহাড়ী জাতিকে আত্মহত্যার দিকে অগ্রসর করে দিচ্ছিল। কিন্তু ভারতের দেবতা তাঁর ন্যায় দণ্ডে এই ব্রিটিশ সিংহকে ধ্বংস করলে-তাই আজ আমরা আত্মহত্যার পথ থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছি। কিন্তু আমাদের চলার পথ এখনও অনেক পড়ে রয়েছে। এই পথ চলতে হবে সমস্ত জাতির মিলনের ভিতর দিয়ে-না হয় থাকবে আমাদের প্রতি পদে বিরাট বাধা। তাই এই পাহাড়ী সঙ্ঘের নব জাগরণের ভেতর রয়েছে দেশের সর্বশ্রেণীর প্রকৃত মঙ্গল-কোথাও হিংসা বা ঘৃণা বা সন্দেহের স্থান হবে না-জাতীয় রাজাগণ প্রজাবৃন্দের স্বার্থ যেন বৃহত্তম মিলনের মন্দিরে সত্যের সোপানে মিলিত হয়-এই পাহাড়ী গণ-সঙ্ঘের সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে —

১। পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বশ্রেণীর পাহাড়ীজাতির রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও জাতীয় দাবী পূরণার্থে স্বাধীন ভারতের নুতন শাসন ব্যবস্থা অনুসারে শাসনকার্যে পূর্ণাধিকার লাভ এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জনমতানুসারে তিন সার্কেলের রাজাসহ শাসনকার্য পরিচালনা।

২। পাহাড়ী জনগণের নিজস্ব ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও জাতিয় রীতিনীতি সংরক্ষণ।

৩। পাহাড়ী জাতির সর্বপ্রকার উন্নতিমূলক পন্থা অবলম্বন। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ী জাতির জনগণ দাবী রয়েছে—যেই পাহাড়ী গণ-সম্মত দৃঢ়তার সঙ্গে জানালে বিগত ৪৮টা এপ্রিল রাস্তামাটিতে যখন ভারতের পরিষদের এডভাইজারি সাবকমিটির সঙ্গে পাহাড়ী গণ-সম্মত সদস্যদের এক ঘণ্টাকালব্যাপি তর্কবিতর্ক হয়। পাহাড়ী গণ-সম্মত মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে নিজেদের শাসনভার নিজেদের হাতেই নিতে হবে। তাই পাহাড়ী গণ-সম্মত উক্ত কমিটির কাছে দৃঢ়ভাবে জানালে—পাহাড়ীগণেরও নিজেদের দেশের মাটির উপর স্মরণাতীত কাল হতে জুম এবং গৃহ নির্মাণ করবার যে সমস্ত স্বত্ব অদ্যাবধি রক্ষা করে(ব্রিটিশ সরকার যে স্বত্ব থেকে তাদের বিচ্যুত করতে পারেনি) সে সমস্ত স্বত্ব পূর্ণমাত্রায় রক্ষা করতে হবে—এই পার্বত্য দেশের মাটির উপর শুধু পাহাড়ীদেরই একমাত্র অধিকার থাকবে। এই পাহাড়ী গণ-সম্মত আরো জানালে জাতীয় তিনজন রাজাসহ প্রজাধারা নির্বাচিত মন্ত্রীমণ্ডলীর সাহায্যে দেশের শাসনকার্য চলবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন সার্কেলকে চাকমা, বোমাং এবং মং বলেই মেনে নিতে হবে—এই রাষ্ট্রগুলো একযোগে দেশের শাসনভার চালাবে এবং দেশ রক্ষা পররাষ্ট্র-নীতি এবং যানবাহন বা যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলোই ছেড়ে দেবে—আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সমস্ত ভার থাকবে জাতীয় রাজা এবং জাতীয় মন্ত্রীসভার উপর। পাহাড়ী গণ-সম্মত উপলব্ধি করেছে এই মুষ্টিমেয় পাহাড়ীজাতিকে বাঁচাতে হলে নিজেদের শাসনভার নিজেদের অধিকারে আনতে হবে। দায়িত্বশীল রাজযুক্ত শাসনতন্ত্রই এই পাহাড়ীবাহিনীর সর্বপ্রথম দাবী।

পাহাড়ী গণ-সম্মত কামনা করে পার্বত্যজাতি তাদের অতীতের হারানো গৌরবকে আবার ফিরিয়ে আনতে এক মহামিলনের ভেতর দিয়ে তার মূল্য যতই হোক না কেন। পাহাড়ী গণ-সম্মত স্বাধীন বাহিনীকে ভুললে চলবেনা যে তারা একদিন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। এই স্বাধীনতা তারা রক্ষা করেছিল বিপুল মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে—এই স্বাধীনতা তারা হারিয়েছে ব্রিটিশ রাজ্যের মিথ্যা ছলনায়। কিন্তু আজ সমস্ত জাতিই সত্যকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছে—জগতের কোন শক্তিই তাদের বাধা দিতে পারবে না। আজ সমস্ত পাহাড়ীজাতিকে আবার জাতীয় পতাকাতলে মিলিত হয়ে সর্বশ্রেণীর মহামিলনের নীতি অনুসরণ করে এগিয়ে চলতে হবে—এই মহামিলনের ভেতর দিয়েই শুধু আসতে পারে জাতির মুক্তি-স্বাধীনতা এবং প্রকৃত মঙ্গল;—তার প্রথম আলো দেখা দিয়েছে আজ

পাহাড়ী গণ-সম্মেলন জাতীয় সঙ্গীতে—

“ডেকেছে দুর্বার, এসেছে জ্যোতিময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমির বিদায় উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক জয়।
তোমারি হউক জয়।
এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়
তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়,
তোমারি হউক জয়।”

প্রবন্ধটি পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম সাহিত্য পত্রিকা “গৈরিকা”—অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ বাংলা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রাজ্যমাটি সদরের শ্রী বিজয় কেতন চাকমার ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে গৈরিকা অগ্রহায়ণ ১৩৫৪ সংখ্যাসহ গৈরিকার বহু প্রকাশনা সংরক্ষিত আছে।

সত্যের পথে মাওরুম’এর
অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকুক
দেবরানী চাকমা
চেয়ারম্যান
বর্মাছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ
লক্ষীছড়ি, খাগড়াছড়ি।

বর্ষবরণ-বর্ষবিদায় উৎসব 'বিষুব সংক্রান্তি' দেশে দেশে পুলক জীবন খীসা

বাংলা বছরের শেষ দুই দিন এবং পহেলা বৈশাখ বর্ষবিদায় ও বর্ষবরণ উপলক্ষে খুব ধুমধামের সাথে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে পালিত হয় সেখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব-বৈসাখি। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন মুখ্য আদিবাসী সম্প্রদায় ত্রিপুরা, মারমা, এবং চাকমাদের মাঝে এই উৎসব যথাক্রমে বৈসুক, সাংগ্রাইন এবং বিবু নামে পরিচিত। তাদের আদ্যাক্ষর নিয়ে ইদানিং এই অঞ্চলের সব সম্প্রদায়ের জন্য এই উৎসবকে অভিহিত করা হয়েছে "বৈ-সা-বি" নামে। বৈসুক, সাংগ্রাইন এবং বিবুর মূল শব্দটি সম্ভবতঃ 'বিষুব সংক্রান্তি'। মুসলিম সম্প্রদায়ের রয়েছে বছরে দুটি বড় উৎসব-ঈদ-উল-ফিতর এবং ঈদ-উল-আযহা। এই দুই বৃহৎ উৎসবকে ছাপিয়ে বাংলা পঞ্জিকার বর্ষবরণ এবং বর্ষবিদায় উৎসব মুসলিম বাঙালীর সংস্কৃতিতে খুব বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পূর্বে ভারতবর্ষের মূল সংস্কৃতিতে খুব সম্ভব 'বিষুব সংক্রান্তি'ই ছিল সবচেয়ে বড় উৎসব। বাস্তবে পাঁচশত বছরের মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসন, দুইশত বছরের বৃটিশ শাসনে প্রাচীন ভারতবর্ষের মূল সংস্কৃতির অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে বা মূয়মান হয়ে এসেছে। হারিয়ে যাওয়া এইসব সংস্কৃতির আসলরূপ খুঁজে পাওয়ার জন্য আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ভারতবর্ষের সেইসব প্রান্তিক অঞ্চলে যেখানে মধ্যযুগীয় মুসলিম শাসন বা দুই শত বছরের বৃটিশ শাসন সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এমনভাবে ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ড থেকে অধুনালুপ্ত একটি সংস্কৃতি হলো "বিষুব সংক্রান্তি"। যা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলে 'বিষু' নামে পরিচিত। 'বিষুব সংক্রান্তি' হলো সেই সময়ের উৎসব যখন সূর্য বিষুব অঞ্চলে লম্বভাবে কিরণ দেয় বা যখন বিষুব অঞ্চল সূর্যকে অতিক্রান্ত করে। বিষুব রেখাকে ডু-গোলকের শূন্য অক্ষীয় রেখা ধরে এই সময় থেকে বর্ষ গণনার রীতি নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতবাসীর জ্যোতির্বিদ্যায় উৎকৃষ্ট জ্ঞানের স্বাক্ষর বহন করে।

চাকমা ভাষায় 'স' বা 'ষ'-কে ঝ হিসেবে উচ্চারণ করা হয়। তাই বিষু চাকমা ভাষায় হয়ে গেল 'বিঝু'। ফুল বিঝু, মূল বিঝু এবং গোয়্যাপর্য্যা দিন এই তিন দিন চলে চাকমাদের বিঝু উৎসব। ফুলবিঝু পালিত হয় বাংলাবর্ষের শেষ দিনের আগের দিন। এইদিন ভোরের আলো ফোটার আগে চাকমা ছেলে-মেয়ে, নারী-পুরুষ বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে আসে ফুল তোলার জন্য-বাগানে, বনে-বাদাড়ে-যেখানে ফুল পাওয়া যায়। নিজের বাগানেতো বটেই, প্রতিবেশীর বাগান থেকে পর্যন্ত ফুল চুরি করতে এদিন কোনো বাধা নেই। তাই রাতভর বলতে গেলে সবাইকে সজাগ থাকতে হয়-নিজে ফুল তোলার আগে অন্য কেউ এসে তার বাগান থেকে ফুল চুরি করলো নাতো! তোলা ফুলের একাংশ দিয়ে বুদ্ধ পূজা দেওয়া হয়, বাকী অংশ দেওয়া হয় নদীতে পূজার অর্ঘ্যরূপে। নদীতে ফুল পূজা দেওয়ার আগে গোসল করা হয়। গোসল আর ফুল দেওয়ার সময় নদীর কাছে প্রার্থনা করা হয়-“জু, মা গঙ্গী, ম-র পুরোন বঝরর আপদবলা, ফিবলা বেগ ধোয় নে যা” অর্থাৎ “প্রণাম হে মা গঙ্গা, আমার পুরোনো বছরের যাবতীয় আপদ বিপদ সব ধুয়ে নিয়ে যাও”।

বিঝু উৎসবের দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ বাংলা বর্ষের শেষদিনকে বলা হয় মূল বিঝু। শব্দ থেকে বোঝা যায় বিঝু উৎসবের মূল বা প্রধান আকর্ষণ হলো এই দিনটি। এইদিন সকালে ছোট ছেলেমেয়েরা খালায় ধান নিয়ে বাসায় বাসায় গিয়ে উঠোনে ধান ছিটায় মুরগীকে খাওয়ানোর জন্য। তারপর শুরু হয় বাসায় বাসায় ঘুরে বিঝু খাওয়ার পালা। উল্লেখ্য বাসায় বাসায় ঘুরতে এইদিন কোন দাওয়াতের প্রয়োজন পড়েনা। প্রতি বাসায় পাজন সহ খাবারের বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। পাজন হলো বিভিন্ন পদের সবজির সংমিশ্রণে রান্না করা তরকারি। পাঁচ অনু(পাঁচন) শব্দ থেকেই সম্ভবতঃ পাজন শব্দের উৎপত্তি, যা তৈরি হয় ন্যূনতম পাঁচ পদের সবজি দিয়ে। সবাই চেষ্টা করে পাজন-এ সবজির পদ বা সংখ্যা বাড়াতে। অনেক সময় একশো পদেরও বেশী সবজি দিয়ে পাজন রান্না করা হয়। এই পাজন ছাড়াও থাকে পিঠে, পায়েস, সেমাই, শরবত ইত্যাদি অনেক ধরনের খাবার ও পানীয়। পাজনের সাথে প্রাপ্তবয়স্কদের আপ্যায়ন করা হয় ঘরে তৈরী মদ দিয়ে। উল্লেখ্য মূল বিঝুর দিনে সাধারণতঃ ভাত এবং মাছ-মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়না। দুপুরে তরুণ-তরুণীরা নদী, কুয়ো থেকে জল তুলে কলসী কাঁখে বয়স্কদেরকে গোসল করায়। বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তিকে গোসল করানো হয়। গোসল করা বা করানোটা হলো পুরানো বছরের ময়লা-আবর্জনারূপ আপদ বিপদ ধুয়ে পূতঃপবিত্র হওয়ার প্রতীক। সন্ধ্যায় মোমবাতি দিয়ে বুদ্ধকে, গঙ্গী মাকে(নদীকে) পুনরায় পূজা করা হয়। বাসায় আলোক সজ্জা করা হয় এবং গোয়াল ঘরও মোমবাতি দিয়ে আলোকিত করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে পুরানো বছরের যাবতীয় অজ্ঞানতা, আপদ-বিপদের অন্ধকার যেন দূরীভূত হয়ে যায়।

বিঝু উৎসবের তৃতীয় দিন বাংলা বর্ষের প্রথম দিনকে বলা হয় 'গোয়্যা পোয়্যা দিন' অর্থাৎ 'গড়িয়ে পড়া দিন'। হিন্দিতে যেমন জন্মদিনকে বলা হয় 'সাল গিড়া' বা বর্ষ গড়িয়ে যাওয়া'র দিন তেমনি চাকমাদের কাছে পহেলা বৈশাখ হলো বছর গড়িয়ে পড়ার দিন। এদিন নিকট আত্মীয়দের দাওয়াত করে ভাত, মাছ-মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। সাধারণতঃ যে গৃহবধুরা অন্যদের আপ্যায়নে ব্যস্ত থাকার কারণে মূল বিঝুতে বেশী শরীক হতে পারেননি তারা এদিন বাড়ী বাড়ী ঘুরেন।

ত্রিপুরা সম্প্রদায় বিষ্ণু-সংক্রান্তিকে 'বৈসুক' নামে অভিহিত করে যা সম্ভবত: বিষ্ণু বা বৈষ্ণু থেকেই উদ্ভূত। তাদের বৈসুক উৎসব চাকমাদের মতোই, তবে তাদের বাড়তি আকর্ষণ হলো 'গৌড়াইয়া নৃত্য'। বৈসুক উৎসবের প্রায় দু-তিন মাস আগে থাকতে এই নৃত্যের জন্য তাদের গ্রামে গ্রামে রিহার্সেল শুরু হয়। এই উদ্দেশ্যে বিশ-ত্রিশ জন নারী-পুরুষ, নর্তক-নর্তকী নিয়ে গঠিত হয় এক একটি গৌড়াইয়া দল। বৈসুকের দিনে এই গৌড়াইয়া দল পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে নৃত্য পরিবেশন করে। বাজনার তালে তালে গৌড়াইয়া নৃত্য দেখতে আসলে অপূর্ব সুন্দর।

'বিষ্ণু সংক্রান্তি' মারমা আর রাখাইন সম্প্রদায়ের কাছে 'সাংগ্রাইন' নামে পরিচিত, যা সংক্রান্তি শব্দটি থেকে উদ্ভূত। চাকমা যেখানে পুরানো বছরের আপদ বিপদ দূরীভূত করার মানসে নদীতে গোসল করে, বয়সীদের গোসল করায় সেখানে সংস্কৃতির বিবর্তনে বর্ষ-বিদায়, বর্ষ-বরণের উৎসব 'সাংগ্রাইন' মারমাদের কাছে হয়ে গেছে পানি ছিটানোর 'জলকেলী উৎসব'। এই উৎসবে নারী-পুরুষ সকলেই অংশগ্রহণ করে পরস্পরের উপর জল ছিটানোর জন্য।

চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জাতিসমূহ সাড়ম্বরে 'বিষ্ণু সংক্রান্তি' পালন করে। এই উপলক্ষে সারা পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামে গ্রামে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। খেলার মধ্যে বাংলাদেশের সমতল এলাকা থেকে ব্যতিক্রমধর্মী খেলা হলো ঘিলা খেলা, নাখেং খেলা ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ব্যতীত অন্যান্য জেলার আদিবাসীরাও পালন করে বিষ্ণু সংক্রান্তি উৎসব। কমলগঞ্জের বিষ্ণুপুরী মণিপুরীদের কাছে এই উৎসব 'বিষ্ণু' নামে অভিহিত। পুরোনো বছরের শেষদিন থেকে শুরু করে সাতদিন চলে এই উৎসব। বিষ্ণু উপলক্ষে চলে পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভিন্ন খাবারের আদান-প্রদান, বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতিযোগিতা। খেলার মধ্যে রয়েছে কড়ি, ঘিলা দিয়ে খেলা ইত্যাদি।

পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো ভারতের আরেকটি প্রান্তিক অঞ্চল হলো হিমাচল প্রদেশ। ভারতের এই হিমাচল প্রদেশ এবং হিমালয়ের প্রায় সব ক'টি রাজ্যে 'বিষ্ণু সংক্রান্তি' বিষ্ণু বা বৃষ্ণ নামে পরিচিত (History and Culture of Himalayan States, Vol-II, Himachal Pradesh: by Sukhdev Singh Charak)। হিমাচলের চম্বা (প্রাচীন নাম চম্বা নগরী), কিন্নোর অঞ্চলের আদিবাসীরা বিষ্ণু পালন করে বর্ষবরণ উৎসব হিসাবে। নেপালেও এই উৎসবকে বলা হয় বিষ্ণু উৎসব।

ভারতের আসামে অসমীয়ারা 'স' বা 'ষ' কে উচ্চারণ করে 'হ' হিসেবে, যেমন তারা নিজেদেরকে বলে অহমীয়া। তাই অহমীয়াদের কাছে বিষ্ণু হয়ে গেলো 'বিহু'। সেখানে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই পালন করে 'বিহু' উৎসব। অবশ্য আজকাল আসামে বিহু শব্দটি স্বতন্ত্র পরিবর্তনের উৎসব অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং সেখানে বিহু পালিত হয় বছরে তিনবার। তারমধ্যে বৈশাখের বা নববর্ষ শুরুর বিহু পালিত হয় আসামের সবচেয়ে বড় উৎসব হিসাবে। আসামের প্রায় প্রত্যেকটি নৃ-জাতির রয়েছে নিজস্ব বিষ্ণু বা বিহু নৃত্য।

দেওরী সম্প্রদায় মনে করে বিষু শব্দটি উদ্ভব হয়েছে তাদের ভাষা থেকে। তাদের ভাষায় 'বি' মানে হলো চরম, 'সু' মানে হলো আনন্দ। তাই তাদের কাছে বিষু হলো চরম আনন্দের উৎসব। আসামের বড়ো সম্প্রদায়ের কাছে নববর্ষের এই উৎসবকে বলা হয় 'বৈশাখ' যা ত্রিপুরাদের বৈসুক শব্দেরই আরেক রূপ।

খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতাব্দীতেই বা তারো আগে ভারতীয় সংস্কৃতি পরিব্যাপ্ত হয়েছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। অন্যান্য অনেক সংস্কৃতির সাথে বিষুব সংক্রান্তিও চলে গেল সেখানে। খৃষ্টীয় এবং ইসলামিক প্রভাব যেখানে পড়েনি সেসব দেশে যেমন মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়াতে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে পালিত হয় এই উৎসব বর্ষবিদায়-বর্ষবরণ উৎসব হিসাবে। ভারতবর্ষে 'বিষুব সংক্রান্তি' বিষুব শব্দ থেকে যেখানে বিষু, বৃষু, বিহু, বিঝু, বৈসুক, বৈশাখ নামে এই উৎসবটি পরিচিত হলো, সেখানে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এর নামকরণ হলো 'সংক্রান্তি' হিসেবে। থাইল্যান্ডে এই উৎসব 'সংক্রান' নামে পরিচিত। <http://phuket-guide.com/Travel-Guide/festival/songkran/web-page>-এ উৎসব সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'Songkran is a Thai traditional New Year which starts on April 13 every year and lasts for 3 days. Songkran is a Thai word which means 'move' or 'change place'। সংক্রান থাইল্যান্ডের সবচেয়ে বড় উৎসব যেটিকে সেই দেশের ট্যুরিজম অথরিটি The Festival of the World-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা করছে। থাইদের সংক্রান উৎসব চাকমাদের বিঝুর মতোই, এদিন বুদ্ধমূর্তিকে গোসল করানো হয় এবং শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ গুরুজনদের হাতে, শরীরে গোলাপ জল ছিটানো হয় সেই একই উদ্দেশ্যে পুরোনো বছরের যাবতীয় আপদ-বিপদ, দুঃখ দুর্দশা যেন ধুয়ে মুছে যায়। সেখানে সংস্কৃতির বিবর্তনে এই উৎসব তরুণ-তরুণীদের কাছে পরিণত হয়েছে পরস্পরের উপর জল ছিটানোর উৎসবে। তাই সংক্রান থাইল্যান্ডে Water Festival নামেও পরিচিত।

আরাকানীরা 'স' কে উচ্চারণ করে 'থ' হিসেবে (যেমন মধ্যযুগের আরকানরাজ 'শ্রী সুধর্ম' কে আরাকানী ভাষায় বলা হতো 'থিরি-থু-ধম্ম') এবং 'র' অনেক ক্ষেত্রে 'য়' হিসেবে (যেমন রেশুন=ইয়াসুন)। তাই মায়ানমারে সংক্রান "থিংকারান" হয়ে পরে হয়ে গেল 'থিংগিয়ান'(Thingyan)। মায়ানমারের www.nagani.com/festivals/thingyan/web-page-এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে-The word 'Thingyan' is said to have been derived from a Sanskrit word, 'Thin ka ran' which means change. মায়ানমারেও এটি হলো সবচেয়ে বড় উৎসব। নববর্ষের ক্রান্তি লগ্নে জল দিয়ে পূতঃপবিত্র হওয়ার রীতি সেখানেও রূপান্তরিত হয়েছে Water Festival-এ।

ভারত শ্রীলঙ্কাসহ দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এপ্রিলের মাঝামাঝিতে 'বিষুব সংক্রান্তি' বা বর্ষবরণ উৎসব পালিত হয়ে আসছে সেই স্মরণাতীত কাল থেকে। পশ্চিমা খুব সম্ভব এই উৎসবকে জানত প্রাচ্যের উৎসব হিসাবে, তাই সেখানে নাম দেওয়া হয়েছিল Easter (<Eastern)। বর্তমানে অবশ্য ঈস্টার পালিত হয় যীশু খ্রীস্টের পুনরুত্থান পর্ব হিসাবে। কিন্তু এই উৎসব যে খ্রীস্টীয় ঈস্টার-এর অনেক আগে থেকেই

পালিত হত তা বুঝা যায় কোনো ভালো ইংরেজি অভিধানে এই শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ দেখলে। Webster's New Collegiate Dictionary-তে ঈস্টার এর ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে বলা হয়েছে "The prehistoric west Germanic name of a pagan spring festival akin to Old English east"। সেই হিসেবে ঈস্টার ছিল মূলতঃ প্রাচ্যের মূর্তিপূজারীদের উৎসব যা হয়তো আর্য নামের দাবীদার জার্মানরাও এক সময় পালন করত। এখানে উল্লেখ্য সপ্তদশ শতাব্দীর আগে পাশ্চাত্যে বা খ্রীস্টীয় পঞ্জিকায়ও এপ্রিল মাসেই নববর্ষ শুরু হত। পরবর্তীতে জানুয়ারী মাসে ইংরেজি নববর্ষ শুরু হওয়ার রেওয়াজ চালু হলে এপ্রিলের শুরুতে নববর্ষের দ্রাব্য শুভেচ্ছা জানানোর রীতি থেকে "এপ্রিল ফুল" সংস্কৃতিটা চালু হয়ে যায়।

'বিষুব সংক্রান্তি' যা ত্রিপুরা ভাষায় বৈসুক, বোড়ো ভাষায় বৈশাখ, সম্ভবতঃ তারই সংস্কৃতি রূপ "বৈশাখ"। আরাকানীরা বৈশাখ মাসকে বলে "থাংথাই লাহ" অর্থাৎ থাংথাই (সাংথাই) বা বিষুব সংক্রান্তির মাস। সেই হিসেবে বৈশাখ মাস মূলতঃ বিষু অর্থাৎ বৈসুক বা বৈশাখুর মাস এবং বৈশাখ শব্দটির উৎপত্তি বিশাখা থেকে না হয়ে বিষুব>বিষু>বৈষু>বৈশুক>বৈশাখ এভাবেই হওয়ার সম্ভবনা বেশী। বস্তুতঃ হিমালয় থেকে শুরু করে সুদূর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিষুব সংক্রান্তির বিস্তৃতির নিরিখে প্রাগৈতিহাসিক এই সংস্কৃতি ব্যাপক গবেষণার দাবী রাখে।

বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে

দীপায়ন খীসা

বিজ্ঞান বিষয়টি যথেষ্ট জটিল ও দুরূহ। বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করার ধৃষ্টতা কিংবা জ্ঞান দু'টোই আমার নেই। তারপরেও বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বের যুগে বাস করছি বিধায় টুকটাক এ বিষয়ে খোঁজ খবর রাখতে হয়। ছোটকালে চুম্বক নিয়ে খেলা একটা মজার বিষয় ছিলো। ছোট্ট লোহার দণ্ডটি কিভাবে যেন আলপিন, পেরেক ইত্যাদি টপাটপ আকর্ষণ করে ফেলতো। এটা নিয়ে কৌতুহলও ছিল অসীম। যারা আমার মত একটু আধটু পদার্থবিদ্যা পড়েছেন তারা নিশ্চয় জানেন চুম্বক কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলে। সেই নিয়মগুলোকে আমরা পড়েছি চুম্বকের ধর্ম হিসেবে। তাছাড়া পৃথিবীটাও নাকি একটা চুম্বক। যেহেতু চুম্বকক্ষেত্রেই বাস করছি তাই চুম্বকের ধর্ম নিয়ে দু'একটা কথা লেখার দুঃসাহস করাটা বোধহয় তেমন ধৃষ্টতা হবে না। তাছাড়া অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী বলে একটা প্রবাদ তো বাজারে চালু আছে। তাই বিজ্ঞান বিষয়ক অনুপরিমাণ জ্ঞানের ওপর ভর করে চুম্বকের ধর্ম নিয়ে একটা ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা বা প্রমাণ দাঁড় করানো এই লেখার প্রধান উদ্দেশ্য। চুম্বকের টান বলে একটা কথা প্রচলিত আছে অর্থাৎ টান পড়লে আসতেই হবে। ইদানিংকালে আমারও তাই হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতি নিয়ে লেখালেখি করার অভ্যাসটা আমাকে প্রতিনিয়তই টানে। আর টানে বলেই মাওরুম প্রতি সংখ্যায় কিছু হল ফোটানো বেয়াদবী মার্কী লেখা লিখে চলেছি।

অনেকেই প্রশ্ন করবেন রাজনীতির সাথে চুম্বকের আবার কি সম্পর্ক? এটা আসলে পুরোপুরি সম্পর্কের বিষয়ও নয়। চুম্বকের একটা ধর্মের সাথে পার্বত্য অঞ্চলের রাজনীতির বড় মিল দেখা যাচ্ছে বহু সময় ধরে। চুম্বকের দুইটি মেরু। একটি উত্তর, অন্যটি দক্ষিণ। দুইটি চুম্বকখণ্ড কাছাকাছি নিয়ে আসলে বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে আর সমমেরু পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। পার্বত্য অঞ্চলের দুই বিপরীত মেরুর রাজনীতির ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি। একটি মেরুতে অবস্থান করছে ইউপিডিএফ, যারা পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর জন্য পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি করছে এবং অন্য মেরুতে রয়েছে

সম-অধিকার আন্দোলন যারা পার্বত্য অঞ্চলের বাঙালী জনগোষ্ঠীর জন্য সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি জানাচ্ছে। বিজ্ঞানের মতো রাজনীতি বিষয়টিও বহু জটিলতায় ভরপুর। এই জটিল বিষয়গুলো যে ভাবে কুটিল হয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করছে সেই দিকে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা এ লেখার উপজীব্য বিষয়।

পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ও সম-অধিকার দাবি দু'টি পরস্পর বিপরীত। একটি পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলছে অন্যটি বাঙালি জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষার দাবি তুলছে। তবে এই বৈপরিত্যের মাঝেও বহু মিল রয়েছে। প্রথমতঃ দুইটি বিপরীত ধারায় ১৯৯৭-এ স্বাক্ষরিত পার্বত্য চুক্তি বাতিলের দাবি জানায়। দ্বিতীয়তঃ উভয়ই জনসংহতি সমিতি ও সমিতির নেতা সন্তোষারমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপ-প্রচারণা ও কুৎসা রটাতে সিদ্ধহস্ত, তৃতীয়তঃ ইউপিডিএফ'এর শীর্ষ নেতা প্রসিত বিকাশ খীসা এবং সম-অধিকার আন্দোলনের মূল নেতা ওয়াদুদ ভূঁইঞা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেন না। চতুর্থতঃ ইউপিডিএফ এবং সম-অধিকার আন্দোলন উভয় সংগঠনই উগ্রজাতীয়তাবাদী ভাবধারায় পরিচালিত, জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক উন্মাদনার জিগির তুলে উভয় সংগঠনের শীর্ষ নেতৃত্ব নিজেদের আখের গোছানোর সু-মহান কাজটি মহা উৎসাহের সাথে চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়াও পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার প্রাক্কালে উভয় সংগঠনই দাবি করেছিল এই চুক্তিতে তাদের স্ব-স্ব জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলী দেয়া হয়েছে। ইউপিডিএফ'এর অভিযোগ ছিল জেএসএস জুম্ম জনগণের অধিকারকে পদদলিত করে, বিকিয়ে দিয়ে চুক্তিতে উপনীত হয়েছে। সম-অধিকার আন্দোলনের শরীকদল বিএনপি ও জামাতের অভিযোগ ছিল তৎকালীন আওয়ামীলীগ সরকার চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডের যে মানচিত্র তার রূপটাই বদলে দিচ্ছে। সেই সময়কালে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া অভিযোগ করেছিলেন চুক্তির ফলে বাংলাদেশের ফেনী জেলা পর্যন্ত অন্য আরেক প্রতিবেশী দেশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার পরপরই উভয় পক্ষই চুক্তি বাতিলের দাবিতে যুদ্ধংদেহী কর্মসূচী ঘোষণা করে। সর্বোপরি ২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইউপিডিএফ প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চার দলীয় জোটের বিশেষ করে খাগড়াছড়ির সাংসদ ওয়াদুদ ভূঁইঞার জয়ী হওয়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এভাবেই প্রসিত বিকাশ খীসা বিএনপি-জামাত জোটকে খাগড়াছড়ির আসনটি উপহার দেন। ওয়াদুদ সাহেবের বিজয়ে উল্লসিত হয়ে প্রসিত বিকাশ খীসা ফুলের তোড়া নিয়ে ওয়াদুদ ভূঁইঞার দরবারে গিয়ে হাজির হন।

২০০১ এর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তরের কিছু আগ থেকেই খাগড়াছড়িতে বিএনপি-জামাত জোট ওয়াদুদ ভূঁইঞাকে জয়ী করার মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনায় সেনাবাহিনীর একটা ভালো ইন্ধনও ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ এর প্রথম জনসভা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার প্রধান দায়িত্বটি সেনাবাহিনীই পালন করে। বিভিন্ন এলাকা থেকে সেনা প্ররোয় লোকজনকে সমাবেশে নিয়ে আসা, নিরাপদে পৌঁছে দেওয়া, সমাবেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ সবগুলো কাজই সেই সময় সেনা সদস্যরা অতিঅগ্রহ ও নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করে। সফলভাবে জনসভা সম্পন্ন করার পর

ইউপিডিএফ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সর্বাত্মক প্রস্তুতি নিতে থাকে। এ ছাড়াও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের মাস তিনেক আগ থেকেই খাগড়াছড়িতে সেনাবাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত জনৈক কর্মকর্তা ইউপিডিএফ নেতৃত্বের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতেন। ইউপিডিএফকে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করানোর জন্য সেই সময় সেনাবাহিনীর আত্ম উদ্দীপনা-পার্বত্য রাজনীতির ক্ষমতার বলয়ে ওয়াদুদ ভুইঞার উত্থানের সাথে একটা নিবিড় যোগসাজশ রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে জাতীয় সংসদে পূর্ণস্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি উত্থাপন করার উন্মাদনা ছড়িয়ে দিয়ে পাহাড়ী ভোটারদের বিভ্রান্ত করার দায়িত্বটা প্রসিত বিকাশ খীসা সুচারুভাবে সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ২০০১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের আড়ালে সেনাবাহিনীর নির্লজ্জ তোষণে ব্যস্ত ছিল ইউপিডিএফ ও দলটির প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা। প্রসিত বিকাশ খীসার পক্ষে খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলার নির্বাচন পরিচালনার সমন্বয়কারী এবং ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলার দায়িত্বপ্রাপ্তদের একজন হিসেবে সেই সময়ে অতি কাছ থেকেই রাজনীতির এই অন্ধকার দিকগুলো পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছিল।

অবশ্য তারও অনেক আগে ১৯৯৭ সালে স্বাক্ষরিত পার্বত্যচুক্তির বিরোধীতা ও বাতিলের দাবী উত্থাপন করে ইউপিডিএফ জুম্ম জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক অনৈক্যের বীজ বপন করে। পূর্ণস্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠার ধ্রুয়ো তুলে চুক্তি বাতিলের দাবী জানিয়ে এই দলটি পক্ষান্তরে রাষ্ট্রপক্ষকেই সাহায্য সহযোগীতা করে চলছে। চুক্তিকে ঘিরে জুম্ম জনগণের এই বিভেদ শাসকশ্রেণীর চুক্তি বাস্তবায়নের অনীহাকে আরো বেশী উদ্বে দিচ্ছে। চুক্তি বাতিল হলে লাভটা কার? জুম্ম জনগণের না শাসকগোষ্ঠীর? চুক্তির বাতিল যদি জুম্ম জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন হয় তাহলে সেগুলো কি কি? এ প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর না দিয়ে ইউ.পি.ডি.এফ শুধু জিগির তুলছে চুক্তি বাতিল করে পূর্ণস্বায়ত্ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চুক্তি বাস্তবায়নের মাধ্যমে আরও অধিক স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার দাবি এই দলটি করছেনা। কারণ এই দাবীটি উত্থাপন করলে জুম্ম জনগণের ঐক্য প্রতিষ্ঠা হবে। আর এই ঐক্য গড়ে তুলতে ইউ.পি.ডি.এফ প্রধান বাধা। পূর্ণস্বায়ত্ত্বশাসন দাবীটি শুনলেই মনে হবে এই দলটি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের জন্য সদা নিবেদিত। প্রকৃতপক্ষে চুক্তির মাধ্যমে জুম্ম জনগণের যেটুকু অর্জন সে অর্জনকে প্রত্যাখান করানোর জন্য জুম্ম জনগণের মধ্য থেকেই একটি কথিত দেশপ্রেমিক গোষ্ঠী দাঁড় করিয়ে চুক্তি বাতিলের দাবী জানানো শাসকগোষ্ঠীর হাতকেই শক্তিশালী করার হাতিয়ার ভিন্ন অন্য কিছু নয়। পার্বত্য রাজনীতিতে ইউপিডিএফ এখন সেই কাজটিই অতি নিপুণভাবে করে যাচ্ছে। জুম্ম জনগণের দীর্ঘদিনের লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল শাসকগোষ্ঠী বার বার চেষ্টা চালিয়েছে সেই ঐক্যে আঘাত হানার। ট্রাইবেল কনভেনশন, চাকমা সংসদ, মারমা সংসদ, ত্রিপুরা সংসদ ইত্যাদি নানা সংগঠন তৈরি করে জুম্ম জনগণের ঐক্যের ফাটল ধরানোর জন্য শাসকগোষ্ঠীর অবিরাম প্রচেষ্টা ছিল। ১৯৮৮-৮৯ সালের দিকে জেএসএস'এর পাঁচ দফার বিপরীতে তৎকালীন এরশাদশাহী ৯ দফা দাঁড় করিয়ে তাদের কিছু তাবেদার গোষ্ঠী তৈরি করে জুম্ম জনতার ঐক্যসংহতি বিনষ্ট করার মহাপ্রকল্প গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সেই মহাপ্রকল্পও জুম্ম জনগণের ঐক্যের স্রোতে ভেসে

যায়। স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জেএসএস যখন সশস্ত্র সংগ্রাম চালাচ্ছিল, সেই ১৯৮০-৮১ সালের দিকে 'দ্রুত নিষ্পত্তি'-র তত্ত্ব হাজির করে একদল কুচক্রী জনসংহতি সমিতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে ভ্রাতৃত্বাভিযুক্ত শুরু করে। জেএসএস'এর তৎকালীন সভাপতি জুম্ম জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ এম.এন. লারমাকে হত্যা করার পর সরকারের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণের মাধ্যমে 'দ্রুত নিষ্পত্তি' তত্ত্বটি অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। 'দ্রুত নিষ্পত্তি'-র মাধ্যমে স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠার কথা বললেও এদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলনকে পিছন থেকে ছুরিকাঘাত করা। শাসকশ্রেণী তাদের তাবেদার গোষ্ঠী তৈরি করার চেয়ে জুম্ম জনগণের মধ্যে কিছু অতিবিপ্লবী গোষ্ঠী সৃষ্টি করতে সক্ষম হলেই জুম্ম জনগণের ঐক্য সংহতিতে ফাটল ধরাতে তা অধিকতর সহায়ক হয়। ১৯৯৭ সালের চুক্তিকে ঘিরে সেই অতিবিপ্লবী গোষ্ঠীটিই তৈরি হয়েছে ইউপিডিএফ নাম দিয়ে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের বুলি আওড়িয়ে, চুক্তি বাতিলের দাবী তুলে জুম্ম জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বাভি সংঘর্ষ তৈরি করে ইউপিডিএফ শাসকশ্রেণীর নিপীড়নের পথকেই সুগম করে দিচ্ছে। ইউপিডিএফ দলটির প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসা বছরে দু-একবার জাপানের সম্রাটের মতো জনতাকে অভিবাদন জানাতে প্রকাশ্যে হাজির হন, অভিবাদন জানিয়ে আবার অন্তঃপুরে চলে যান। প্রসিত সহ তার অধিকাংশ চেলা-চামড়ুরা পর্দার আড়ালেই থাকতে বেশী পছন্দ করেন। অন্তঃপুরে কে থাকবে বা প্রকাশ্যে দেখা দেওয়া, না দেওয়া সে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্নতোলা কিছুটা শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজও বটে। কিন্তু যখন এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তিগত না হয়ে সমাজ-রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তখনই তা আলোচনার পাদ প্রদীপে চলে আসে। মনুষ্য প্রজাতির মধ্যে যারা একটু অধিক পরিমাণে বেশী রক্ষণশীল তারা পর্দাপ্রথা মেনে চলেন। আর যারা চক্রান্ত চালায়-তারাও পর্দার অন্তরালে থেকেই একাজটি করতে বেশী ভালোবাসেন। প্রসিত বিকাশ খীসাও পর্দার অন্তরালে থেকে লর্ডব্রাইভের মতো ষড়যন্ত্র পাকাতে সিদ্ধহস্ত। বিপ্লব সংগ্রামের মুখোশ পড়ে তিনি একাজটি এখনও দিব্যি করে চলছেন। ১৯৯৭ সালের চুক্তি স্বাক্ষরের পর চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় ১৯৯৯ সালের প্রথম দিকে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব হস্তান্তর নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। জনসংহতি সমিতি আঞ্চলিক পরিষদের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে। জেএসএস দাবী নিয়ে অটল থাকার কারণে সরকার বিকল্প পথ খুঁজতে থাকে। তৎকালীন শরণার্থী কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ও সাবেক সাংসদ উপেন্দ্রলাল চাক্মাকে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে বসানোর একটা প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। উপেন্দ্রলাল চাক্মা জনসংহতি সমিতি বিরোধী জুম্ম জনগণের সাথে আলোচনা শুরু করেন। স্বভাবতই এই আলোচনার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল ইউপিডিএফ'কে দলে ভিড়ানো। উপেন্দ্রলাল চাক্মা ইউপিডিএফ'এর সাথে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন। হোপখানা রোডের একটি হোটেলে উপেনবাবুর সঙ্গে আলোচনার স্থান ও তারিখ নির্ধারণ হলো। আলোচনার টীমটিতে প্রসিত বিকাশ খীসার সাথে অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম। বৈঠকটি বেশ ফলপ্রসূ হয় এবং কিছু বিষয়ে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি ছিল, উপেনবাবু আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এর দায়িত্ব গ্রহণ করলে ইউপিডিএফ তাঁর বিরোধীতা করবে না, বিনিময়ে ইউপিডিএফ মিছিল, মিটিং, সমাবেশ সহ সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত পরিচালনা

করতে পারবে। উপেনবাবুর নেতৃত্বে গঠিত আঞ্চলিক পরিষদ ও ইউপিডিএফ উভয়ে একযোগে জনসংহতি সমিতির উপরে চাপ সৃষ্টি করবে এবং একসাথে আক্রমণ চালানোর বিষয়মূহ নিয়েও সেই বৈঠকে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈঠকের সূত্র ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কল্পরঞ্জন'এর সাথে আলাদা আলোচনা করার সিদ্ধান্ত ও নেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে আওয়ামীলীগ সরকারের নীতি নির্ধারণী মহল এ বিষয়ে আর বেশী না এগুনোতে উপেনবাবু আর ইউপিডিএফ'এর আঁতাত তেমন কার্যকর হয়নি। এই হচ্ছে ইউপিডিএফ দলটির বিপ্লবী চরিত্রের অন্যতম নমুনা। সেদিন বিপ্লবের মোহে এতই মোহিত ছিলাম যে, সেই গোপন আঁতাতে আমি অতি উৎসাহের সাথে অংশ নিয়েছিলাম। আর পার্বত্য রাজনীতির ঘটনা প্রবাহের আমিও একজন হিসেবে বেশ শিহরিত হয়েছিলাম।

বিপ্লবের মোহে স্বাধিকারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে এরকম অনেক গোপন মিশনে আমার অংশগ্রহণ করার বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বিপ্লবের মোহ ধীরে ধীরে কাটতে শুরু করলো। ঘুমের ঘোর কেটে বাস্তব চক্ষু দিয়ে ইউপিডিএফ রাজনীতিকে যখন জানতে শুরু করলাম তখন অনেক দেবী হয়ে গেছে। বিপ্লবের ফাঁকা বুলিতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক তরুণ অকালে জীবন দিচ্ছে আর পার্বত্য রাজনীতিতে ইউপিডিএফও একটা স্থান করে নিয়েছে। স্বাধিকারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে সেদিন জুম্ম জনগণের মধ্যে অনৈক্যের বীজ রোপণ করতে অংশ নিয়েছিলাম, এখন সে বীজটি বিষবৃক্ষে পরিণত হয়ে বিষাক্ত ফল উৎপাদন করছে। পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের মুখোশ পরে, দেশপ্রেমের বাণী শুনিতে প্রসিত বিকাশ খীসা কি কি বড়যন্ত্রের জাল বুনে যাচ্ছে তা প্রকাশ করে দিয়ে বিষবৃক্ষটি সমূলে উৎপাটন করতে হবে। পার্বত্য রাজনীতিতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে সেই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য ইউ.পি.ডি.এফ দলটি নিজেকে ত্রাতা হিসেবে পরিচয় করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে শুরু থেকে। আর দলটির প্রধান প্রসিত বিকাশ খীসাকে মূল ত্রাণকর্তা তথা মুক্তির অবতার হিসেবে দেখানোর একটা জোর প্রচারণাও এই দলটির রয়েছে। কিন্তু এই দলটির মূলকাজটি হচ্ছে একটা কৃত্রিম সংকট তৈরি করে, পার্বত্য অঞ্চলে যুদ্ধের দামামা বাজিয়ে দিয়ে সেনাবাহিনীকে সেখানে বহাল তবিয়ে থাকা সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া। ভ্রাতৃঘাতী সংঘর্ষের আড়ালে ইউপিডিএফ সেখানে সেনাবাহিনীর অবস্থানকে পাকাপোক্ত করার সকল আয়োজন সুসম্পন্ন করে দিচ্ছে। পার্বত্য চুক্তির পরে চুক্তির শর্তানুসারে সেনাক্যাম্প, অস্থায়ী সেনাছাউনী গুটিয়ে নেয়ার জন্য সরকারের উপর একটা চাপ তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু ইউপিডিএফ দলটি টুকটাক অস্ত্রের মহড়া দেখিয়ে, একটা সশস্ত্র সংগ্রামের হাবভাব জিইয়ে রেখে সেনাবাহিনীকে পার্বত্য অঞ্চলে সক্রিয় রাখার অপকর্মটিকে জায়েজ করে দিচ্ছে। সুতরাং শাসকশ্রেণী, সেনাবাহিনী, সমঅধিকার আন্দোলন এবং ইউপিডিএফ'এর পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আন্দোলন আঞ্চলিক অর্থে পরস্পরের বিপরীত হলেও তাঁদের মূল লক্ষ্য একটাই তা হচ্ছে জুম্ম জনগণের বিনাশ সাধন। “বিপরীত মেরু পরস্পরকে আকর্ষণ করে”-চন্দ্রকের এই সূত্রটি আবারও প্রবাসত্য হয়ে পার্বত্য রাজনীতির কিছু অপ্রিয় সত্য উৎঘাটন করতে আমাদেরকে সাহায্য করছে।

ব্যাখ্যান-এব নতুন বই-২০০৫

অনুবাদ

| | |
|-------------------------------|-------|
| অরিয়েন্টালিজম-এডওয়ার্ড সাঈদ | ৩০০/= |
| দি আর্ট অফ লাভিং-এরিক ফ্রম | ৬০/= |

প্রবন্ধ/গবেষণা

| | |
|--|------|
| মা জন্মভূমি [৩য় মুদ্রণ] নির্মল সেন | ৭৫/= |
| ধর্ম নিরপেক্ষতা ও মানব সমাজ-আব্দুর রাজ্জাক | ৬০/= |

লালন

| | |
|---|-------|
| লালন সঙ্গীত সমগ্র (১ম খন্ড) | ১৬৫/= |
| লালন পদ : আমার দৃষ্টি ভঙ্গি- নুরুল ইসলাম | ৭০/= |
| তোমার নামের মহিমা জানাওগো সাই-আবদেল মান্নান | ১০/= |

সুফি দর্শন

| | |
|--|-------|
| কোরান দর্শন (১ম খন্ড) সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী | ৩৭৫/= |
| কোরান দর্শন (২য় খন্ড) সদর উদ্দিন আহমদ চিশতী | ৩৫০/= |
| বঙ্গে সুফি প্রভাব-ড. মুহম্মদ এনামুল হক | ১২৫/= |

ব্যাখ্যান পাবলিশার্স

২৬ বাংলাবাজার, ৩৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০, ফোন : ৭১১৯৮৯৫, ০১৭৮০৩৩৫৭০